KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮, সরকার মার্কেট স্ট্রীট, কলকাতা-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 1/1 1/2-3 1/4 2/1	Year of Publication : July - Sep 1976 Jan - March 1977 Apr - Jun 1977 July - Sep 1977
	Condition : Brittle / Good
Editor : শমীক বক্সী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

৩

বভাব

বভাব

সম্পাদক/মণীশ নন্দী

প্রকাশিত হল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার কথা বাংলাসাহিত্য-পাঠকদের কাছে অবিদিত নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রীতিও অকুণ্ঠ ছিল। কিন্তু এই শ্রদ্ধা ও প্রীতি অন্ধ বা নির্বিচার ছিল না। তাই কোনো কোনো সময়ে, বিশেষত, ধর্ম ও সমাজ চিন্তার বিষয়ে তাঁদের মতপার্থক্যও দেখা দিয়েছে প্রকাশ্য বিরোধে। বঙ্কিম-রবীন্দ্র বিতর্কের সেই অধ্যায়গুলি এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমুদয় লেখা বিভিন্ন রবীন্দ্র-গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে একত্রে সংকলিত করে রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের একটি সম্পূর্ণ আলেখ্য এখনকার কৌতূহলী পাঠকের কাছে তুলে ধরা হল।

এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুরে সরলাদেবী-কৃত বন্দেমাতরম্ গানের প্রথম স্তবকের স্বরলিপি, পরিশিষ্টে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাসঙ্গিক দুটি রচনা এবং বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় এই গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। সংকলন করেছেন—শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্র-শোভিত প্রচ্ছদ, এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি-চিত্রে শোভিত হয়ে এবারের কবিপক্ষে প্রকাশিত হ'ল। মূল্য ১০·০০ টাকা।

আমার মা'র বাপের বাড়ি

শ্রীরানী চন্দ

'পূর্ণকুম্ভ', 'হিমাদ্রি', 'গুরুদেব', 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ', 'আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ' এবং 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' ইত্যাদি গ্রন্থের স্বনামধন্যা লেখিকার মাতুলালয়ের এক শুচিস্নিগ্ধ আলেখ্য।

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের ধলেশ্বরীপাড়ের এক গ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পালাপার্বণ সামাজিক অনুষ্ঠান প্রাকৃতিক পরিবেশ সুখদুঃখ আনন্দবেদনার সরস কাহিনী একটি বালিকার গভীর পর্যবেক্ষণের ফলে বর্ণিত। মূল্য ১০·০০ টাকা।

সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড

মূল্য ৪৫·০০ টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয়: ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ৭১

বিক্রয়কেন্দ্র: ২ কলেজ স্কোয়ার'২১০ বিধান সরণী

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

বিভাব

সূচীপত্র

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

এপ্রিল-জুন সংখ্যা

১৯৭৭

সামরিক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত ১৯৭

প্রবন্ধ

ভালোবাসা বর্বর । পিনাকী ভাদুড়ী ১৭

গণতন্ত্রের জয় । গুণানন্দ ঠাকুর ২৬

কবিতাগুচ্ছ

শংকর চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা । ত্রিদিব ঘোষ ৩৩

একগুচ্ছ কবিতা । শংকর চট্টোপাধ্যায় ৩৫

শিল্পভাবনা

গ্রাহাম সাদারল্যাণ্ডের চিত্র-ভাবনা । নৃপেন্দ্র সান্যাল ৪০

পুরাতনী

নজরুল ইসলামের "ধূমকেতু" । অলোক রায় ৪৬

কবিতাগুচ্ছ

যোগব্রত চক্রবর্তীর কবিতা । তারাপদ রায় ৬৬

একগুচ্ছ কবিতা । যোগব্রত চক্রবর্তী ৭০

ব্যক্তিগত রচনা

মৃত্যু : প্রেম । বিমল রায়চৌধুরী ৭৩

গ্রীষ্ম : উনিশশো সাতাত্তর । উৎপলকুমার বসু ৭৮

বিদেশী সাহিত্য

তাদেউশ রুজেভিচ্-এর কবিতা । মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩

চিঠিপত্র

রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে একটি চিঠি । স্বরূপানন্দ সরস্বতী ৯৬

সম্পাদক

মণীশ নন্দী

সম্পাদক মণ্ডলী : পবিত্র সরকার । কবিরুল ইসলাম ।
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় । প্রদীপ দাশগুপ্ত ।

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৫/১ সি, ওল্ড বালীগঞ্জ রোড । কলিকাতা-৭০০০১৯

প্রচ্ছদ : শঙ্কর ঘোষ

কভার মুদ্রণ : দি র‍্যাডিয়েন্ট প্রোসেস্

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলি-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং রাজধানী প্রিন্টিং, ১১৭/১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত ।

বাংলা সাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র
স্থাপিত ১৯৭৮

সম্পাদকীয়

আমরা রাজনৈতিক কারণে সকলশ্রেণীর বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবী করি। দাবী করি কারাগারের ভিতরে অসংখ্য গোপন হত্যার দ্রুত তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি। নতুন নির্বাচনে যারা জয়ী, তাদের সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই শুধুমাত্র আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে কিন্তু বাংলার মানুষ তাদের ভোট দেয় নি, তারা সত্যিকারের কিছু কাজ চায়। আপাতত কাজ মানে, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন যে সব সমস্যার মুখোমুখি হয় তার যথাসম্ভব সত্বর প্রতিকার। রাজনৈতিক আদর্শগত সমস্যা এখন দেশের জনসাধারণকে ততটা বিচলিত করে না যতটা করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা। বাংলাদেশে যে বারবার পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে তার মূলে বোধহয় সহ্যের সীমায় চলে যাওয়া প্রতিকারহীন অস্থিরচিত্ত মানুষের ক্রোধ, এবং ভোট ছাড়া এদেশে তা জানাবার আর কোন পন্থা এখনো গড়ে ওঠেনি। বোধহয় কাররাইলই একবার বলেছিলেন "অশিক্ষিত দেশে গণতন্ত্র প্রহসন মাত্র"। স্বাধীনতার দীর্ঘ একত্রিশ বছর পরেও সাধারণ স্তরে এই প্রবহমান অশিক্ষাই জনতাকে বারংবার ব্যবহৃত হতে দিয়েছে দলকেন্দ্রিক নেতাদের হাতে। অবৈতনিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক প্রচার না ঘটলে এ হবেই।

নতুন সরকার আমাদের আশা জাগিয়েছেন, আমরা তাঁদের অগ্রিম অভিনন্দন জানাই। আশা করবো তাঁরা মূল সমস্যাগুলির দিকে নিষ্ঠ নজর রাখবেন। এই দেশে মন্ত্রবলে বা দলীয় ক্ষমতায় রাতারাতি কিছু হবার নয়। তবু আন্তরিক

প্রয়াস থাকলে, বিভিন্ন পরিকল্পনার মঞ্জুরীকৃত অর্থের সিংহভাগ বিভিন্ন স্তরের অমায়িক চোরদের পকেটে না গেলে, উন্নতি শুরু হওয়া সম্ভব। রাজ্যে ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এবার অনেক যোগ্য ব্যক্তি এসেছেন, (আগেও যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তাঁরা এক অসহায় পুতুলনাচের শিকার হয়েছিলেন), সুতরাং আশা রইল তাঁরা অন্তত কিছুদিন দলের কথা ভুলে গিয়ে দেশের কথা মনে রেখে কাজ করবেন।

গত সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর অনেক প্রিয়জনকে আমরা হারিয়েছি। আচার্য সুনীতিকুমার গেলেন। বয়স ৮৭ হলেও এই মুক্তমন পাণ্ডিত্যের দম্ভ-বর্জিত মানুষটি জীবনের শেষদিন অবধি আমাদের সংস্কৃতি-জগতে ছিলেন সক্রিয়। রামায়ণ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থটি শেষ হলে আমরা উপকৃত হতাম।

একে একে গেলেন হিন্দীসাহিত্যের প্রতিভাবান লেখক শ্রীফণিশ্বরনাথ রেণু, আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ কবি যোগব্রত চক্রবর্তী, গল্পকার বিমল রায়চৌধুরী এবং বাঙ্গলার সংস্কৃতিজীবনে প্রকাশনার ক্ষেত্রে যিনি বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন সেই পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত—সকলের ডি. কে। আমরা তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। যোগব্রত চক্রবর্তী ও বিমল রায়চৌধুরীর রচনা এ সংখ্যায় প্রকাশিত হ'ল। বিভাবের পরবর্তী সংখ্যায় দিলীপকুমার গুপ্ত সম্পর্কে একটি বিশেষ মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হবে, লিখবেন তাঁর এককালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

আগামী সংখ্যা বিশেষ-সংখ্যা হিসাবে অক্টোবরের প্রথমে প্রকাশিত হবে।

বাংলা সাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র

প্রবন্ধ

ভালোবাসা বর্বর

পিনাকী ভাদুড়ী

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় প্যাশন নেই—এ কথাটা জয়ন্তী উৎসর্গ গ্রন্থে লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কিন্তু তাঁর 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা' প্রবন্ধে এর বিপরীত কথাটি লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈহিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব্বরস উদ্বোধন করিয়াছেন।

আমরা, যারা সাধারণ পাঠক, আমরা কোন্ দিকে? সত্যি কথা বলতে কি, আমরাও রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলতেই পছন্দ করি। অবশ্য ঋষিদের চেতনা থেকে দৈহিক ব্যাপার যে বিলুপ্ত হয়ে যায়, এমন কথা কিন্তু বলা চলে না।

রবীন্দ্রনাথের কিংবদন্তীসুলভ রূপ, তাঁর বিশিষ্ট পোশাক ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁকে প্রায় দেবদূতের পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছে। সেজন্য আমরাও ভাবি, রবীন্দ্রনাথ নিছক সৌন্দর্যের পূজারী—এসব বাসনার মত্ততা নিয়ে তিনি নিশ্চয় কিছু রচনা করেননি।

এই কামনা-বাসনার ব্যাপারটার কিছু আধুনিক প্রকাশ কয়েকক্ষেত্রে দেখেই এরকম মনে হয়ে থাকবে আমাদের। একটা কথা গোড়াতেই পরিষ্কার হয়ে গেলে বুঝতে সহজ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন জীবন সম্বন্ধে উৎসাহী। অপারেশনের আগেও শেষ যে কবিতা তিনি রচনা ক'রে গিয়েছেন, তা-ও জীবনের প্রতি অনুরাগে রঞ্জিত। ভালবাসার যে রঙ বাসনায় রঙিন, তা যে তাঁর মনেও জাগবে, এটাই স্বাভাবিক। সেই বাসনাকে তিনি সোনা করে দিয়েছেন তাঁর ভাষায়, ভাবে, কল্পনায়। অর্ধেক কল্পনা তুমি—তাঁর এই পংক্তি

কেবল রচনা-ই নয়, জীবনও। কামনাকে তিনি বয়ে নিয়ে কামনার পরপারে চলে যেতে জানেন। সেজন্যই, কামনার অন্তে সচরাচর যে ক্লান্তি আসে, রবীন্দ্রনাথে তা হয় না, বরং গাঢ়তর হয়ে হৃদয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়।

বিষয়টিতে প্রবেশ করবার আগে আমি দুটি চিঠির উল্লেখ করতে চাই। এ দুটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন দিলীপকুমার রায়কে—চিঠি দুটির তারিখ ১লা এবং ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন আটষট্টি। এই বয়সেও তিনি লিখছেন—

স্ত্রী পুরুষের ও বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের দৈহিক শুচিতা রক্ষা সম্বন্ধীয় সংস্কার যে সকল আর্থিক ও সামাজিক কারণের উপর এতদিন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ছিল, সেই কারণ-গুলো ক্ষীণ হলে বা বিলুপ্ত হলে এটা কেবলমাত্র উপদেশের জোরে থাকতেই পারে না।……স্বভাবকে ঠেকিয়ে রাখা আর সহজ হয় না।……ব্যভিচার সম্বন্ধে এই কথাটাই খাটে। এর মধ্যে যে অপরাধ সেটা সামাজিক, অর্থাৎ যদি সমাজে অশান্তি ঘটে, তবে সমাজের মানুষকে সাবধান হ'তে হয়; যদি না ঘটে তাহলে ব্যভিচার ব্যভিচারই হয় না—ভয় দেখিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য তাকে যে কালো মুখোস পরিয়ে রাখা হয়েছে সেটা খসে গেলে দেখা যায় ওর উপরে নরকের ছায়া নেই।

এই চিঠিকে আরো স্পষ্ট করবার জন্য পরের দিনই কবি যে চিঠি দেন তাতে লেখেন—স্ত্রী পুরুষের শারীরিক সম্বন্ধ যেখানে অসত্য এবং অশান্তির যোগ সেটা ব্যভিচার—যেখানে সে আশঙ্কা নেই সেখানে সন্ন্যাসীর কথায় কান দেবার প্রয়োজন দেখিনে।

অসত্য শারীরিক সম্বন্ধ বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চেয়েছেন? যেখানে অশান্তি, অর্থাৎ যেখানে দু'পক্ষের মত নেই, ব্যাপারটা রেপ-এর মতো হয়ে যাচ্ছে, সেখানেই অন্যায়? নইলে ব্যভিচার ব্যভিচারই নয়?

ব্যাখ্যা যাই হোক, একথা পরিষ্কার যে রবীন্দ্রনাথ দৈহিক কামনাকে অস্বীকার করতে তো চান-ই নি, বরং সাদরে মেনে নিয়েছেন।

আর একটি কথা ব'লেই আমরা বিষয়টির অভ্যন্তরে যাবার চেষ্টা করবো। সেটি হলো এই যে, রবীন্দ্রনাথের রচনার কেন্দ্রবিন্দুটি হলো কবির। কবিতার সুরে স্বভাবতই সব কিছু নরম হয়ে আসে। যেমন তাঁর গল্পের চরিত্রেরা। তারা

অনেকেই এসেছে দরিদ্র জীবন থেকে। কিন্তু সে দারিদ্র্য কর্কশ হয়ে ওঠেনি—কেবল তাদের অন্তহীন যন্ত্রণা করুণ সুরের মতো ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম চেতনার মধ্যে বাসনার যে রক্তিম অংশ, তা শুধু রক্তাক্তই-নয়, তার অতীত এক অনুভূতিও বটে।

যৌনতা, একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই সাংঘাতিক হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে যৌনতার রূপকল্প কখনোই বীভৎস হয়ে ওঠেনি।

বক্ষের নিচোলবাস, গড়াগড়ি যায়, ত্যাজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে—
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা, অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি—

দুই ভিন্ন কবিতার এই দুই উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথ, রমণীবক্ষের আবৃত এবং অনাবৃত, দুটি রূপই উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন। মনে হতে পারে এবম্বিধ ক্ষেত্রে তাঁর কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ রয়েছে, যেজন্য এই প্রসঙ্গে তিনি, পূজা স্বর্গ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক শব্দ ব্যবহার করছেন। নারীদেহ সম্বন্ধে যে বাসনাঘন প্রকাশ হওয়া উচিত, তা যেন হয়ে উঠছে না। কিন্তু আমরা দেখবো, রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ কত নিবিড় হয়ে উঠছেন এই চিত্রকল্প রচনায়।

একটি শরীরের যে প্রকটতা অন্য শরীরে নেশা ধরায়, তা চিরস্থায়ী মায়া প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা ছিল বলেই তাঁর রচনায় যৌনতা শেষ কথা হয় না। কালিদাসের আলোচনাতেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে সংস্কৃত কবি কামনার রঙ ফলালেও সেখানেই কাব্য শেষ করেননি, কারণ কামনার শক্তি বিপুল হলেও সে সর্বশেষ কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথও সব শেষের পরে অশেষকে খুঁজে ফিরেছেন সারাজীবন। প্রেমিকার পাশে বসে তার হাত ধরে তিনি তাই বলে ওঠেন—

—কোথা তুমি? যে অমৃত লুকানো তোমায় / সে কোথায়?

চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যে অর্জুনকে কামনায় উন্মত্ত দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু নারীর ললিত লোভন লীলায় তার ক্লান্তি এসে গেল, তার উত্তরণ ঘটলো রমণীর অন্য রমণীয়তায়। মনে করা যাক, চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সেই বর্ণনা, যখন অর্জুন কামনায় ডাক দিলো, সাড়া দিলো রমণীর যৌবন—অপূর্ব এই পংক্তির অবস্থিতি বাসনার তুঙ্গে—মিথ্যা শরম সংকোচ খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মত—একেবারে আদিম স্ফুরিত নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছে যে

বসন, সংকোচহীনতার সঙ্গে, নির্লজ্জতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সেই বসনকে।

তারপরেই সেই ইঙ্গিতবহ পংক্তি—

—দুই বাহু দিলাম বাড়ায়ে।···অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী··· / স্বর্গমর্ত্ত
দেশকাল দুঃখসুখ জীবনমরণ অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে—

সরাসরি একটি রতিক্রিয়ার থরথর বর্ণনা স্মৃতি থেকে উদ্ধার ক'রে আনা হয়েছে, কিন্তু অবয়বটি আশ্চর্য রোমান্টিক, লজ্জাহীন হয়েও নির্লজ্জ নয়। যে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই পংক্তিতে নিজের অভিজ্ঞতার স্মৃতি মন্থন ক'রে রোমাঞ্চিত হবেন।

কিন্তু এর পরেই চিত্রাঙ্গদা ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে—

সে চুম্বন, সে প্রেমসংগম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝংকার সম, সে তো মোর নহে।

তার মনে হচ্ছে, ঐ চুম্বন, ঐ সংগম যে দেহ ভোগ করেছে, সে-ই তো তার সতীন। লক্ষ্য করতে হবে, রবীন্দ্রনাথ এখানে 'সংগম' শব্দটি পূর্বরাত্রের যৌন-সুখের পরিচয় হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। এই কাহিনী যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে পুরুষ কেবল প্রবৃত্তির তাড়নায় রমণীর সঙ্গ প্রার্থনা করে না, তার চেয়ে বড়ো একাত্মচেতনায় তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। গ্যেটের কথা মনে প'ড়ে যায়, বিরাট যৌনজীবন যাপন করলেও ফাউস্টের মুখ দিয়ে তিনি ব'লে উঠেছেন—
The eternal feminine draws us upward.

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয়ার সন্ধানে গিয়েছেন উজ্জয়িনীতে। সেখানে প্রিয়ার দেহসৌন্দর্য দেখতে ভুল করেননি তিনি।

—প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন অন্তরে / চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে

কবিতাটি শেষ হয়েছে দুরন্ত কামনার বেগে—

রজনীর অন্ধকার / উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার
দীপ দ্বারপাশে / কখন নিভিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে,

আমরা বুঝতে পারি আলো নিবে গেল কেবল বাতাসে নয়, বাসনায়। সেই অন্ধকারে আমরা পরবর্তী ঘটনাটা কল্পনা ক'রে নিতে পারি।

তাঁর অনুসূয়া কবিতার একটি দেহজ বর্ণনা—

পিনদ্ধ বল্কলবদ্ধ যৌবনের বন্দীদূত দোঁহে / জাগে অঙ্গে উদ্ধত বিদ্রোহে-

অকালঘুম কবিতায় যে ঘুমন্ত মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নায়ক, সে,

—চমকে জেগে উঠে দেখলে আমাকে / তাড়াতাড়ি বুকে কাপড় টেনে / অভিমানভরে বললে—ছি ছি।

নায়ক সেই স্খলিতবসনার রূপ দেখে ভাবছে, যাকে খুব জানি, তাকেও জানিনে।

এই যে বোধ—যাকে জানছি তাকে পূর্ণ জানছি না, মিলনের মধ্যে সে বিরহিণী—এই অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনায় একটি অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছে, ফলে তাঁর যৌনচেতনায় অন্তরস্থ মানুষের অন্য চেতনার ছায়া পড়েছে বারবার।

সরাসরি 'স্তন' নামে দুটি কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিবসনার রূপ দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে বলেছিলেন—

ফেলো গো বসন ফেলো—ঘুচাও অঞ্চল—

নিদ্রিতাকে দেখে লিখেছেন—

যেমনি ভাঙিবে ঘুম মরমে মরিয়া
বুকের বসনখানি তুলে দিবে বুকে।

এগুলো অল্পবয়েসের লেখা। পরিণত বয়সে এই বোধ আরো পরিণত হয়েই দেখা দিয়েছে। তাঁর একটি গান মনে করা চলে—

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হলো মরি লাজে
আমি এ আকুল কবরী আবরি কেমনে যাইব কাজে।

একটি মিলনবিধুর নায়িকার ঘুমভাঙার ছবি। এই সঙ্গে যে ছবি আমাদের মনের ভেতরে ফুটে ওঠে, তা হলো গত রাত্রের দেহমিলনের মুহূর্ত। যার অনিবার্যতা হিসেবেই নায়িকার চুল এলোমেলো, ঘুম ভাঙতে দেরী। এই ইঙ্গিতময়তাই রবীন্দ্রনাথের যৌনতা প্রকাশের মূলমন্ত্র।

আর একটি রমণীয় বর্ণনা—

যৌবনরাশি টুটিয়া লুটিতে চায় / বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে / চলিতে ফিরিতে ঝলকি ছলকি উঠে,

—কি মনে হয়? অনেক আবেগ, অনেক উন্মত্ততাকে কতটা রূপময় ক'রে তোলা যায়, এটি তারই উদাহরণ।

আর একটি উদ্ধৃতি—

তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে সখী, হাসি মুকুলিত মুখে—

হাসি মুকুলিত, এই শব্দযোজনাতেই একটি যৌন-সোহাগকে উন্মোচিত ক'রে দেওয়া হলো। অত্যন্ত খুশী হয়ে একটি নারী কোন পুরুষের সোহাগোন্মাদনাকে প্যাসিভ তৃপ্তিতে গ্রহণ করেছিল। এই কবিতার শেষে কবি রাত্রের অবসানে প্রভাতের একটি শুচিস্নাত রমণীর ছবি প্রকাশ ক'রে কামনাকে পার হয়ে চলে গিয়েছেন।

দেহজ রূপ, যাতে বাসনার আগুন জ্ব'লে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় তারাও রঙিন হয়েই এসেছে। তাঁর পতিতা কবিতার বিষয়টাই হলো দেহের মোহ-বিস্তার ক'রে ভোলানো। কিন্তু এখানেও শেষপর্যন্ত বলা হয়েছে যে দেহকে স্বর্গ মানলে বারাঙ্গনাও তৃপ্তি পায় না, তার সুখ মেলে উচ্চতর কোন প্রশস্তি বাচনে—

মধুরাতে কত মুগ্ধ হৃদয় স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা, শুনিনি এমন সত্যবাণী।

পরিশোধ কবিতাটি একটি বহুবর্ণ বাসনার ছবি, যার উদগ্র তাড়নায় কোন নারী নিরীহ প্রাণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে। এর নাট্যরূপটিতে নায়কের শেষ স্বীকারোক্তি—ক্ষমিতে পারিলাম না যে—সেই আর্তস্বর শুনে আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে যায়। কার জন্য? কামুকী শ্যামার জন্য। রবীন্দ্রনাথ বাসনার আবেগকে তুচ্ছ করতে চাননি তাহলে। এই কবিতায় নায়ক, নায়িকার বসন জড়িয়ে তৃপ্তি পেতে চাইছে, এটি একটি যৌনতার অভিব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাসের একটি অংশ—

কুমু...বিছানা থেকে বেরিয়ে এসে বললে, আমাকে অপরাধিনী কোরো না। মধুসূদন গম্ভীরকণ্ঠে বললে, কী চাও বলো, কী করতে হবে?...

কুমু বললে, শুতে এসো।

এই অংশটির বিষয় হলো সেই স্বামীস্ত্রীর চিরাচরিত শয়নকালীন সম্ভোগ। কিন্তু এই পরিচ্ছেদ জুড়ে এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন যে তার জন্যও একটা মানসিক প্রস্তুতি চাই, চাই ভাললাগার আবেশ—এবং এটি বোঝাবার জন্য তাঁকে অনেক শব্দ ও সময় ব্যয় করতে হয়েছে।

এই উপন্যাসের একটি চরিত্র প্রগল্‌ভা শ্যামা। সে কুমুর চেয়ে কম সুন্দরী, কিন্তু 'ওর চোখ, ওর চুল, ওর রসালো ঠোঁট'।

রসালো, এই শব্দটিতে একটি কামনার বাজনা বাজছে। পাঠককে এই শব্দ প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য করতে বলি।

রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি উপন্যাসে বিনোদিনীর সর্বাঙ্গে যে চমক, যে যৌনতার আভাস, তাতে এর স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি ছিল সর্বনাশে। লেখক তা, যে কারণেই হোক, ঘটতে দেননি। কিন্তু এর পাতায় পাতায় দেহজ বাসনার মত্ততা।

—ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনী নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল।...বিনোদিনী উপুড় হইয়া শুইয়া গুণগুণ গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া রহিত, তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিত...। বিনোদিনী প্রশ্ন করিয়া করিয়া তুচ্ছতম কথাটি পর্যন্ত বাহির করিত, এক কথা বার বার করিয়া শুনিত...।

মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রতি যে প্রবল মোহে আকৃষ্ট হয়েছিল, তার নাম বাসনা। বিনোদিনী প্রতি ক্ষণে ছলনায় ছলকে উঠেছে, পতঙ্গের মতো আছড়ে মরছে মহেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এখানেও এই উন্মত্ততাকে শান্ত ক'রে দিয়েছেন—এই বাসনার পশ্চাতে একটি গভীর ভালবাসা বিনোদিনীকে দগ্ধ করেছে, মহেন্দ্রও শেষপর্যন্ত আশার প্রেম, মমতার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে।

চতুরঙ্গ উপন্যাসের দামিনীও বিনোদিনীর মতোই, বা আরো বেশি রহস্যে মোড়া। দামিনীতে যে রহস্য, যৌনতার সেই রহস্যই মানুষকে মোহময় ক'রে রাখে। শচীশের ডায়েরীতে যে অন্ধকারের জন্তুর কথা বলা হয়েছে, তাকে চিনতে একটু দেরী হয়ে যায় বর্ণনার ভঙ্গীর জন্য, কিন্তু তার আদিমতা ধরা পড়ে মনোযোগ করলেই।

...আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা।

...কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁয়া আছে—এর রোঁয়া নাই।...মনে হইল একটা সাপের মত জন্তু, তাহাকে চিনি না...কীরকম মুণ্ড, কীরকম গা, কীরকম লেজ কিছুই জানা নাই, তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ।

...হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে।...

পাঠক জানেন, এই বর্ণনার প্রাণীর নাম দামিনী। এই তার কামনার রূপ ছিল। এই উপন্যাসের প্রথম অংশেই আমরা দেখি পুরন্দর ননীবালাকে সন্তানসম্ভবা ক'রে পালালো। তাকে বিবাহ করতে চাইল শচীশ। ননীবালা কিন্তু আত্মহত্যা করলো। কারণ, 'তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই।' যৌনতার আক্রমণের সঙ্গে যৌথভাবে এক অদ্ভুত ভালবাসার আক্রমণ আমরা দেখতে পাই, যার ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। হয়তো এ ভালবাসা যৌনতা থেকেই উদ্ভূত।

—হোলিখেলার দিন।...দিলে তার মাথায় আবীর মাখিয়ে...মাতামাতির পালা পড়ে গেল। ...হাত চেপে ধরে আঁচল থেকে ফাগ কেড়ে নিয়ে···মুখে দিলে ঘ'ষে,···দৌড়োদৌড়ি, ঠেলাঠেলি···।

···রাত্রি হয়েছে অনেক। ...পূর্ণচাঁদ উঠেছে অনাবৃত আকাশে। ... জানলার কাছে ঊর্মি চুপ ক'রে ব'সে। ···বুকের মধ্যে রক্তের দোলা শান্ত হয়নি। ...নাবার ঘরে গিয়ে মাথা ধুয়ে নিলে, গা মুছলে ভিজে তোয়ালে দিয়ে।···

দুই বোন উপন্যাসে এই বর্ণনাটুকুতে ঊর্মির না ঘুমোনোর কারণ কী, তা স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। গা মুছে নিতে হয়েছে ঊর্মিকে—আমরা এই আকর্ষণ নিজেদের জীবনেও হয়তো অনেকবার বুঝতে পেরেছি। রবীন্দ্রনাথ এই ভয়ঙ্কর কামনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন, যেখানে কামনার অন্তে অবসাদ আসে না, আরো প্রবল, আরো চিরন্তন আনন্দবেদনায় আমরা বিদ্ধ হই।

রবীন্দ্রনাথের বোষ্টমী গল্প এই প্রসঙ্গে মনে আসে। নায়িকার ছেলে মারা যাবার পরে সে গুরুকে আশ্রয় করেছিল। তার পরে—

—ভিজাকাপড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে লজ্জায় একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। ...বলিলেন, তোমার দেহখানি সুন্দর।

ডালে ডালে রাজ্যের পাখি ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে...ফুল ফুটিয়াছে,

আমের ডালে বোল ধরিয়াছে। মনে হইল, সমস্ত আকাশ পাতাল পাগল হইয়া আলুথালু হইয়া উঠিয়াছে।···

নায়িকা ঘর ছেড়ে চলে গেল। কারণ সে বুঝতে পারলো গুরুর ঐ দৃষ্টি তারও ভাল লেগে গিয়েছে। কি অসহায় এই যৌনতার মোহ।

রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্পগ্রন্থ তিনসঙ্গী। এই গ্রন্থের রবিবার গল্পে অভীক বলছে বিভাকে, মেয়েদের শরীর সম্বন্ধে—

—তোমাদের ভগবান যদি সাম্যবাদী হতেন, তা হলে মেয়েদের চেহারার এত বেশী উঁচু নীচু ঘটিয়ে রাস্তায় ঘাটে এরকম মনের আগুন জ্বালিয়ে দিতেন না।

—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সত্তর পার হয়ে রবীন্দ্রনাথ শেষ উপন্যাস লিখলেন, চার অধ্যায়। সেখানে সোজাসুজি বললেন,—ভালোবাসা বর্বর। এলা তার বুকের জামা ছিঁড়ে ফেলে অতীনের সামনে দাঁড়ালো,—নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার।

ভালবাসার জন্যই দেহ, ভালবাসার জন্যই বর্বরতা। কিন্তু বৃক্ষের মূলের মতো তা' আড়ালেই থাকে।

গণতন্ত্রের জয়

গুণানন্দ ঠাকুর

সম্প্রতি ভারতীয় জনগণের জয়ধ্বনিতে সারা বিশ্বের আকাশ বাতাস মুখরিত। ভারতীয় জনগণ অসাধ্যসাধন করিয়াছে। তাহারা অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারিণী-নেত্রী আর তস্যা কুপুত্রকে মতদানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছে। আমেরিকা ইংলণ্ড পাকিস্তান সব দেশেই সংবাদপত্রে ভারতীয় জনগণের এই বৃহৎ কৃতিত্বের কথা সবিস্তারে প্রচারিত হইয়াছে। কত না স্তুতি গীত হইয়াছে সম্পাদকীয় স্তম্ভে। সর্বদিক দিয়া আজ ভারতের বড় সুদিন। গুণানন্দ বহুদিন প্রগতিশীল সংসর্গ করিতেছে তথাপি দেশপ্রেমকে শয়তানের শেষ আশ্রয়স্থল বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে নাই। তাহার মন এই পরিণত বয়সেও সম্যক আন্তর্জাতিক হয় নাই তাই তাহার কাছে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মন্ত্র শুধু গ্রহণযোগ্যই নয় অপিচ অতি মধুর মন্ত্র। সুতরাং তাহার অতি প্রিয় স্বদেশের এ হেন গুণকীর্তনে তাহার অতি আহ্লাদিত হইবারই কথা কিন্তু গুণানন্দের খুশী কই? তাহার অস্বস্তির কথা আপনারা শুনিবেন কি? গুণানন্দের সহিত আপনাদের একমত হইতে হইবে না শুধু ভাবিয়া দেখিবেন এই স্তুতিকে কি আপনারা নির্বিচারে সত্য বলিয়া মানিবেন?

পাঠক, আসুন কিয়ৎক্ষণের জন্য আমরা ১৯৭৫ সালের ঘৃণিত সেই দিনটিতে ফিরিয়া যাই, যেদিন ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পদদলিত করিয়া ইন্দিরা গান্ধী দেশে আইনবহির্ভূত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলেন। পাঠক, গুণানন্দ বহু পাঠেও দ্বিতীয়বার জরুরী অবস্থা ঘোষণার কোন হদিস সংবিধানে পায় নাই। [Article 352 (1): If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened whether by war or external aggression or internal disterbance he may by Proclamation, make a declaration to that effect. পাঠক, এখানে 'a' শব্দটি লক্ষ্য করিবেন এবং স্মরণ রাখিবেন ১৯৭১ এর ডিসেম্বরের ৩ তারিখের

রাত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইয়াছিল] রেডিও ঘোষণা করিল সমস্ত সভাসমিতি নিষিদ্ধ, সংবাদপত্র শৃঙ্খলিত, দেশ এখন কার্যত একজন মাত্র নেত্রীর অধীন। দেশের চরমতম দুর্দশার ক্ষণে গণতন্ত্র অগ্রে না দেশের নিরাপত্তা অগ্রে? আপনারা কি শোনেন নাই দেশে অরাজকতা সৃষ্টির কি ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিয়াছে? সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত হইল বিংশতি-সূত্র কর্মসূচী। দেশের উন্নতির "চিটিং ফাঁক" মন্ত্র।

পাঠক, আপনার স্মৃতিশক্তির সম্বন্ধে গুণানন্দের কোন সন্দেহ নাই, তবু আসুন আমরা স্মরণ করি সেইদিনের কথা। গুণানন্দের গণতন্ত্রভক্তি অতি অকৃত্রিম তাই সে ভাবিয়াছিল দেশের লোকের রোষে ইন্দিরা গান্ধী রাজ্য হারাইবে। কিন্তু মাত্র কয়েকটি স্থলে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া আমরা কি ভয়ানক শান্ত চিত্তে জনগণকে পোষ মানিতে দেখিলাম। যাঁহারা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের শস্যক্ষেত্রে শস্য ফলান. যাঁহারা নগরের উপকণ্ঠের বিশ্বকর্মার কামারশালার কারিগর, তাঁহারা আমাদের দেশে কোনদিনই রাজ্য ভাঙ্গাগড়ায় কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং পাঠক, আপনি কিংবা গুণানন্দ যখন ভাবিয়াছিলেন যে দেশের সাধারণ মনুষ্যসকল বিদ্রোহ করিবে তখন আপনি ইতিহাসে কতটা অজ্ঞ তাহারই পরিচয় দিতে ছিলেন। নতুবা আপনাদের মস্তিষ্ক ধৌতকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কারণ আপনি যে শুনিয়াছিলেন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে ভারতের প্রথম বীর তিতুমীর। অধিক কি আপনি যে শুনিয়াছেন যে ভারতে যাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি বলিয়া পূজা পাইয়া আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক। ২০৮১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় যৎকালে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে তখন দিবাকর প্রভার ন্যায় সহজেই প্রতিভাত হইবে যে সেই মুহূর্তেই কত না রাজকুমার রাক্ষসীর প্রাণ মরণ ভ্রমরের অন্বেষণে ছুটিয়াছিল। গুণানন্দ কিংবা আপনি এই প্রকার তথ্যের সন্ধান জানেন না তাই আপনি শুধু মনে করিতে পারিতেছেন যে বঙ্গদেশগৌরব বিপ্লবী বাঙালী করণিক কুল তাহাদের জীবনের সর্বপ্রথম যথা নির্দিষ্ট সময়ে তাহাদের কর্মস্থলে উপস্থিত হইলেন। আমরা উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিলাম। অহো মহান নেত্রীর কি মহিমা! দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়াছে!

পাঠক, আপনার নিশ্চয় প্রতিরোধের সামান্য দু' একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। আপনি নিশ্চয় গৌরকিশোর ঘোষ, নিরঞ্জন হালদার ইত্যাদির নাম মনে করিতেছেন। গৌরকিশোর ঘোষ বঙ্গদেশে একমাত্র মেরুদণ্ডী প্রাণী

গুণানন্দ এস্থলে তাঁহাকে তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। তথাপি এ কথা সত্য সেই দিনগুলিতে আমরা জরুরী অবস্থা মানিয়া লইয়াছিলাম। সকলেই নিরাপত্তা খুঁজিয়াছিলাম। আর বুদ্ধিজীবী নামে পরিচিত কিছু সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী বুকে হাঁটিয়া যাইয়া অত্যাচারীর অনুচরবর্গের পদসেবা করিয়াছিল। প্রমাণ আছে প্রমাণ দিব। সে কথা পশ্চাৎ আলোচনা করিব। বর্তমানে দেখা যাউক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কি করিয়াছিলেন। ২৫শে জুন হইতে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হইল। কাহারা গ্রেপ্তার হইলেন? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের মধ্যম শ্রেণীর কর্মীবৃন্দ। না বৃহৎ রাজনৈতিক দলের (বঙ্গভাষা অনভিজ্ঞ বঙ্গসন্তান) সুশ্রী নেতৃবৃন্দ নহে—রাজরোষ পড়িয়াছিল তাঁহাদের উপর যাঁহাদের নাম সংবাদপত্রের প্রথম পংক্তিতে কদাপি স্থান পায় না। এই দগ্ধ বঙ্গদেশে ইন্দিরা বিরোধী বিশেষ কেহই ছিল না। [এ স্থলে গুণানন্দের পরিচিত একজন নেতার কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। ইনি যখন গ্রেপ্তার হ'ন তখন তাঁহার মাতৃদেবী গুরুতর পীড়িত। সরকার দয়াপরবশত তাঁহাকে মাতৃদেবীর সহিত শেষ সাক্ষাতের অনুমতি দিয়াছিল। হস্ত শৃঙ্খলিত কটিদেশ রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় যখন মাতৃদেবীর শেষ শয্যাপাশে আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন মৃত্যুপথযাত্রী মাতৃদেবীর মন নিশ্চয় নির্মল আনন্দে ভরপুর হইয়াছিল।] আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় অতিবিপ্লবী, বিপ্লবী আর অর্ধবিপ্লবী নেতৃবৃন্দ সেদিন নিরাপদ পন্থা (হয়তো বাধ্য হইয়াই) গ্রহণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সম্বন্ধে অধিক বলিবার কিছু নাই তবে ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন যে যতদিন পর্যন্ত না পদাঘাত মিলিয়াছে ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের কোন নেতা তাহাদের তথাকথিত নেত্রী মাতৃদেবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই। আমাদের যাঁহাদের উপর বিশ্বাস ছিল যাঁহারা প্রতিবাদ করিলে রাক্ষসীরাজ কায়েম হইতে পারিত না, তাঁহারা কেহই প্রতিবাদ করেন নাই। বঙ্গদেশের যুবকরা স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ তাঁহাদের নিষ্ঠা তাঁহাদের আত্মলুপ্তির দ্বারা যে সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহার সবটুকু ধ্বংস করিয়াছিলেন আরেকজন বঙ্গসন্তান যিনি ভারতের উচ্চতম ন্যায়াধীশের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আপাত ধর্মভীরু এই ভদ্রলোক কি কারণে তাঁহার বিবেক বিসর্জন দিয়াছিলেন? উত্তর কে দিবে?

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে পত্রিকার ভূমিকা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে সেই পত্রিকাটিরও (নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন) ভূমিকা ছিল অতি

ন্যক্কারজনক। ইহারা শুধুমাত্র জরুরী অবস্থা সমর্থন করিয়াই ক্ষান্ত দেয় নাই বর্ষশেষে ষোড়শোপচারে ঢক্কানিনাদ সহযোগে বিরাট সভার আয়োজনও করিয়াছিল। বহু দিবস ধরিয়া তাহারা সংবাদপত্রের অতিরিক্ত সংখ্যাও প্রকাশ করিয়াছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের চিন্তার স্বাধীনতার স্বনিযুক্ত ধারক এবং বাহক বলিয়া দাবী করে যে আরেকটি বহুল প্রচারিত পত্রিকা তাহারও ভূমিকা কম মসীলিপ্ত নহে। কলিকাতার গৌরবরক্ষার ভার শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছিল পারসীক সন্তান পরিচালিত এবং পঞ্চনদ সন্তান সম্পাদিত সৎসাহসী ইংরাজী কাগজটির উপর। গুণানন্দ জরুরী অবস্থা উঠিবার পর কাহাকেও ইঁহাদের নামে রক্তিমবর্ণ কিংবা হরিৎবর্ণ সেলাম বাজাইতে দেখে নাই। এখন যখন জরুরী অবস্থার সমর্থক কিংবা ইন্দিরাপন্থী কাহাকেও গোচরে আনিতে পারি না তখন এই দুই বীরের সম্মান কিভাবে দেওয়া যাইতে পারে তাহা ভাবিয়াই পাই না।

এই সমূহ সর্বনাশের মধ্যে সবচাইতে ঘৃণ্য সবচাইতে বিবমিষা উদ্রেককারী ভূমিকা ওই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের—যাহাদের সরীসৃপ জাতীয় বলিয়া আগে উল্লেখ করিয়াছি। অন্যান্য দেশে বুদ্ধিজীবীরা জনগণের বিবেকরূপে কাজ করে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের বুদ্ধিজীবীরা লোভী উঞ্ছবৃত্তিধারী এবং কাপুরুষ। গুণানন্দ দেখিয়াছে কিভাবে এক তরুণ উদ্যমী কবি [একদা যিনি বিপ্লব এবং প্রগতির সাধনা করিতেন, যাঁহার পিতাও সাম্যবাদের কবিরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন] পার্ক হোটেলে গিয়া যশপাল কাপুরের করুণাভিক্ষা করিয়াছেন। ওই বালকটিকে পৃথক করিয়া লাভ নাই সেই করুণাপ্রার্থীদের মধ্যে অনেক রথী মহারথীরা ছিলেন। আকাশবাণী এবং দূরদর্শন ক্রমাগত অনৃত ভাষণে হিটলারের জার্মানীকে অতিক্রম করিয়াছিল। কলকাতার কোন বুদ্ধিজীবীই 'আকাশবাণী কিংবা দূরদর্শনের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করেন নাই। বাংলার কবিপাল জনে জনে কবিতা লিখিয়াছে আকাশবাণীর আদেশমত। এক গুচ্ছ কবিতার বিষয়-বস্তু ছিল—"যে দেশের প্রতি কর্তব্য করে না তাহার কোন মৌলিক অধিকার নাই।" সেই সব কবিরা আজও কলম ধরিতেছেন দেখিতে পাই। লজ্জা ঘৃণা ভয় সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের বাণীই সত্য। সেই অন্ধকার যুগে অত্যাচারিনী একবার রাজভবনে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ গিয়াছিল পুলিশ সিপাহী মারফৎ। কেহ অনুপস্থিত হয় নাই। কলিকাতার দুইটি বাংলা দৈনিক গদগদভাষিত এক বিবরণী দিয়াছিল সে সভার। আজিও সে সব পত্রিকা জাতীয় গ্রন্থাগারে রহিয়াছে কাহারও কাহারও ব্যক্তিগত সংকলনেও সন্ধান

মিলিতে পারে। সে সব বিবরণীতে দেখিবেন সকলে কিরূপ পোষা ময়নার মতো ব্যবহার করিয়াছিল। সত্যজিৎ রায়কে কেন জনঅরণ্য ছবি তুলিতে দেওয়া হইল সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠিয়াছিল। সম্প্রতি গণতন্ত্রভক্ত (!) সিদ্ধার্থ রায় কি স্পর্ধা দেখাইয়াছিলেন সে কথা যেমন ভুলি নাই তেমনি ভুলি নাই প্রশ্ন-কর্তাকেও। ভুলি নাই কাহাকেও। ভুলি নাই সেই সব গায়ক-গায়িকাদের যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমিতে রবীন্দ্র সংগীত সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা মানিয়াছিলেন। ভুলি নাই সেই গায়িকাকেও যিনি শান্তিনিকেতনের পুণ্যভূমিতে দাঁড়াইয়া অত্যাচারিনীর যাত্রারম্ভে গান গাইয়াছিলেন "জয়যাত্রায় যাও গো"। পরমেশ্বরের অশেষ করুণা সে যাত্রা বিজয় যাত্রা হয় নাই।

দেশে এত বড় গণতন্ত্রের বিজয় তবে কি ভাবে আসিল? এই যে মতদানের মাধ্যমে নিঃশব্দ বিপ্লব ইহা সম্ভব হইল কি প্রকারে? গুণানন্দ বিশ্বাস করে জনতার রোষবহ্নি রাক্ষসী রাজকে বিনষ্ট করিয়াছে। কিন্তু এ রোষের উৎস কি? পীড়নই কি এই রোষের কারণ? তাহা যদি হইবে তবে দক্ষিণ ভারতে এ রোষ প্রকাশিত হইল না কেন? স্নেহলতা রেড্ডীর উৎপীড়ন কি কর্ণাটকে হয় নাই? রাজন নামে সেই বালকটি কি দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য কেরল হইতেই চিরতরে নিরুদ্দেশ হয় নাই? সম্প্রতি শোনা গেল তাহাকে জানিয়া শুনিয়াই হত্যা করা হইয়াছিল। তবু উত্তর ভারতে কি প্রকারে পীড়নের খবর প্রচার হইল? তবে কি উত্তর ভারতে সংবাদপত্রের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হয় নাই। তাহাও নয়। উত্তর ভারতে নিপীড়ন বহুদিন হইতেই চলিতেছে। উগ্রপন্থী দমনের নামে সরকারের পুলিশ নির্বিচারে যুবক হত্যায় মাতিয়াছে। বঙ্গদেশে সে কথা অবিদিত নাই। তবু তো প্রতিবাদ উঠে নাই। পরন্তু গুণানন্দ কি শোনে নাই যে রাজ্যশাসনে বলপ্রয়োগ অতি আবশ্যক। গুণানন্দ কি আরো শোনে নাই যে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে যাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব নহে অথচ যাহারা নিশ্চিত ভাবেই দোষী তাহাদের কারাগারে হত্যা করার মধ্যে অন্যায় নাই? পাঠক, যদি আশ্চর্য লাগে তবে শুনিয়া রাখুন এ কথা শুধু নগর কোটালের নহে, এ ভাষা বঙ্গদেশের সর্বোচ্চ আদালতের কতিপয় ন্যায়াধীশেরও।

তবে কি পুত্রের আবির্ভাবই দেশের লোককে বিমুখ করিয়াছে? গুণানন্দের মতে ইহাও সত্য নহে। বঙ্গ তথা ভারতে পুরুষানুক্রমিক রাজ্যচালনা কিংবা ক্ষমতায় থাকার ভিতর (যোগ্য হইলে তো কথাই নাই) কোন দোষ দেখা হয় না। স্মরণ করিবেন জওহরলাল মতিলালের পুত্র, ইন্দিরা জওহরলালের কন্যা,

কে. সি. পন্থ, গোবিন্দবল্লভ পন্থের পুত্র, কে ডি মালব্য মদনমোহন মালব্যের পুত্র, বিদ্যাচরণ শুক্লা রবিশংকর শুক্লার পুত্র, পদ্মজা নাইডু সরোজিনী নাইডুর কন্যা, সিদ্ধার্থ রায় দেশবন্ধুর দৌহিত্র—প্রমাণ বাড়াইবার দরকার নাই। সঞ্জয় গান্ধীকে লোকে অপছন্দ করিয়াছে ইহাও ঠিক নহে। অহো, সঞ্জয় যেথায় গিয়াছে মনুষ্যের ভিড় উপচাইয়া পড়িয়াছে, সংবাদপত্রসমূহ বৃহৎ কলেবর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছে।

গুণানন্দের ধারণা জনতার আসল রোষের কারণ হয়তো নির্বীজকরণে বলপ্রয়োগ এবং সেই সম্বন্ধীয় ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবরণ। উত্তর ভারতে পরিবার পরিকল্পনার নাম করিয়া কর্মচারীরা ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনিয়াছে অত্যাচারের কাহিনী পল্লবিত হইয়া আরো ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। গ্রামের জনসাধারণ এতদূরই ভীত হইয়া পড়িয়াছিল যে কুম্ভমেলায় সকলেই দলবদ্ধ অবস্থায় থাকিত। পরিবার পরিকল্পনা একটি অতি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম। আমাদের দেশের বৃহৎ জনসংখ্যা সীমিত করিতে সর্বপ্রকার প্রয়াস কর্তব্য। ইন্দিরা সরকারই প্রথম অতি বলিষ্ঠভাবে এ কার্যক্রম প্রয়োগ করিতে উদ্যোগী হন। বহুপূর্বে ডঃ চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে একবার চেষ্টা হইয়াছিল তখন আমাদের দেশের প্রগতিশীল দল ইহাকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত অভিধা দিয়াছিল। আজ যখন রাশিয়া চীন সকলেই পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তখন সেই শিবাধ্বনি আর শ্রুত হয় না। কিন্তু দেশের নিরক্ষর সমাজে এখনো প্রতিরোধ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। আকাশবাণীর সমস্তপ্রকার প্রচার সত্ত্বেও মুসলমান সমাজও এই প্রকল্পের প্রতি আজিও বীতরাগ। উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলের ভোট তাই এইবার ইন্দিরা সরকার পান নাই।

অত্যাচার, অন্ধপুত্রস্নেহ, সংবিধান পদদলন, এই সমস্ত অন্যায় সত্ত্বেও পরিবার পরিকল্পনায় বলপ্রয়োগ না থাকিলে উত্তর ভারতে এই পরাজয় ইন্দিরার হইত না গুণানন্দের ইহাই দৃঢ়মত। তাহাই যদি হইবে তবে সেই ঘৃণিত ৪২নং সংশোধনের সুযোগ লইয়া কেন নয়টি রাজ্যের বিধানসভা ভাঙা হইল? এখনো কেন ৪২নং সংশোধনের ভবিষ্যৎ কি হইবে সে সম্বন্ধে কোন ঘোষণা নাই? ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে জনতা পার্টির বিজয়ের পর আমরা কি দেখিতেছি? কংগ্রেসে যে মধুমক্ষিকারা সর্বদা ভিড় করিয়া থাকিত তাহারা সকলে আসিয়া জনতায় ভিড় করিতে শুরু করিয়াছে। কংগ্রেসের নির্বাচন প্রার্থী হইতে যেরূপ শিবাকুক্কুর যুদ্ধ হইত জনতা নির্বাচন প্রার্থী হইতেও সেইরূপ যুদ্ধ দেখা

যাইতেছে। ইহারা কাহারা? আজ যাঁহারা গাড়ী লইয়া ধর্ণা দিতেছেন জনতা পার্টি অফিসে তাঁহারাই কি গতকাল সঞ্জয় সংবর্ধনার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন না? দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে শুধুমাত্র নাম বদল হইয়াছে পালার কুশীলব সব একই প্রকার আছে।

আজ বোধ হইতেছে দেশমাতৃকার সেবা একমাত্র আইনসভার সভ্য হইলে সম্ভব নচেৎ নহে। অথচ ইহা সত্য নহে। জনতা পার্টিও নির্বাচন পদপ্রার্থীর জন্য দরখাস্ত আহ্বান করিয়াছেন। যাহাদের ধারণা হইয়াছিল যে যোগ্য লোক বাছিয়া জনতা পার্টি নির্বাচনে প্রার্থী দিবে তাহাদের আশাভঙ্গ হইয়াছে।

গণতন্ত্রের তথাকথিত জয়ে সবচেয়ে খুশী যে দল সেই দলও অতীতে কয়েক বৎসর পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিল, সে সময়ের কথা অনেকেই এখনো ভুলিতে পারেন নাই। করুণিকরা মনে করিয়াছিল যে তাহারা মাহিনা লইতে স্বীকার করিয়া দেশের উদ্ধার করিয়াছে। ইহার উপর তাহাদের কাজও করিতে বলা অন্যায়। একটি মহান আদর্শের ছুঁতো ধরিয়া এ হেন কুকর্ম নাই যাহা সংঘটিত হয় নাই। গুণানন্দ তথনো ইহাকে গণতন্ত্রের জয় বলিয়া মানিতে পারে নাই। পরমতসহিষ্ণুতাই গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ। ইন্দিরা গান্ধী যাহা করিয়াছিলেন—অনুরূপ অবস্থায় কট্টর সাম্যবাদী নেতৃবৃন্দ অনুরূপব্যবহার করিতেন বা করিতেন না তাহা ভাবিবার বিষয়।

তবে কি গণতন্ত্রের কোন জয় কোথাও হয় নাই। গুণানন্দের মতে গণতন্ত্রের দুটি বৃহৎ জয় হইয়াছে। প্রথম জয় ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচন ডাকিয়াছিলেন। তাঁহার হিসাব এবং ইচ্ছা যাহাই হউক না কেন তিনি যে রাজত্বের যথার্থতা বিচারের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর কথা ভাবিয়াছিলেন ইহা গণতন্ত্রের নিশ্চিত জয়। গণতন্ত্রের দ্বিতীয় জয় নির্বাচনী যন্ত্র সাধারণভাবে নিরপেক্ষভাবে কর্ম করিয়াছে। হিটলার এবং স্ট্যালিনের আমলেও একাধিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু সে-স্থলে নির্বাচন প্রহসনেরই নামান্তর। ভারতবর্ষের বহুলোক আশংকা করিয়াছিলেন অনুরূপভাবে নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত হইবে। তাঁহাদের আশংকা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। গণতন্ত্রের এই দুইটি জয় ক্ষুদ্র করিয়া দেখিবেন না। কিন্তু ইহা আরম্ভ মাত্র। গণতন্ত্রকে বাঁচাইতে অতন্দ্র প্রহরীর প্রয়োজন। সে প্রহরীর কর্ম করিতে পারে নির্ভীক সংবাদপত্র, শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলী এবং মেরুদণ্ডী বুদ্ধিজীবী। পাঠক, আপনি গুণানন্দের সহিত একত্র হইয়া প্রার্থনা করুন প্রাথমিক জয় যখন হইয়াছে তখন অন্তিম জয়ও যেন হয়।

শংকর চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

ত্রিদিব ঘোষ

কোন কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকা অনেক সময় তাঁর কবিতা হৃদয়ঙ্গম করার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। তখন ঝোঁক হয় তাঁর কবিতার মধ্যে তাঁকে খুঁজে বের করতে, তাঁর কবিতাকে তাঁর আত্ম জীবনীর নামান্তর হিসাবে গ্রহণ করতে। কিন্তু কবির ব্যক্তিগত জীবনের আলোকে তাঁর কবিতার বিচার বহুক্ষেত্রেই আলোকপাত না করে আঁধির সৃষ্টিই করে। কারণ তখন কবির কাব্যকে কাব্যের ঐতিহ্যের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের চক্রব্যূহের মধ্যে বন্দী করে ফেলা হয় অভিমন্যুর মতো। কবির কাব্যকে কবির একান্ত ব্যক্তি-জীবনের প্রকাশ হিসাবে ধরাটা মানুষের মানস-জীবনের রহস্যকেও যেন অস্বীকার করে, কারণ কোন কবির কাব্য অনেক সময় কবির প্রাত্যহিকতায় আবিল জীবনের চিত্র না হয়ে তা তাঁর মনের গভীরে লালিত স্বপ্নের প্রকাশ হতে পারে। এমন কি এটা হতে পারে সেই 'স্বরূপ-বিরোধিতা' (anti-self), সেই 'মুখোশ' (mask), যাদের দ্বারা কবি নিজের তথাকথিত পরিচিত সত্তাকে আবৃত করতে চান। কবির কাব্য এমনও রূপ নিতে পারে যার মধ্য দিয়ে কবি তাঁর তথাকথিত বাস্তব জীবন হতে বহির্গমনের একটা পথ নির্মাণ করে নিতে চান। বেঁচে থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সমূহ যখন শিল্পায়িত হতে চায় শিল্পের নিয়মে তাদের একটা মৌল রূপান্তর, জন্মান্তর না হয়ে পারে না এবং এটাই বোধহয় শিল্পের দাবী, কাব্যের দাবী। শংকরের কবিতা যখনই পড়েছি, আমার তখনই প্রস্তাবনা হিসাবে উপরে যা বললুম, তাই মনে হয়েছে।

মনে হয়েছে এ কোন্ শংকর চট্টোপাধ্যায়? চায়ের টেবিলে হৈ-চৈ করা, প্রবল, প্রচণ্ড প্রাণোচ্ছ্বাস ভরা শংকর চট্টোপাধ্যায় এ তো ঠিক নয়! এ তো বোহেমিয়ান হিসাবে 'সুখ্যাতি' কিংবা 'অখ্যাতি' যার ছিল সেই শংকর চট্টোপাধ্যায় ঠিক নয়। শংকরের কবিতায় পড়েছে সেই বিষাদের ছায়া যাকে এড়ানো হয়তো কোন সংবেদনশীল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু বিষাদ নয় আছে জিজ্ঞাসা এবং সম্ভবতঃ এই বিষাদ জিজ্ঞাসা-প্রসূতই এবং তৎসহ রয়েছে প্রত্যাশাও। কিসের? সব কিছুকে উত্তীর্ণ হয়ে অন্য কোন গভীর উপলব্ধিতে পৌছান সম্ভব এই প্রত্যাশা, যে উত্তীর্ণতা সমস্ত জীবনের অর্থ, সমগ্র মানব-পরিস্থিতির অর্থ অন্য কোন দিগন্তে প্রসারিত করে দেবে? কবির কাব্যের পরিণতির জন্য সংসারে তাঁকে দেহধারণ করে কিছুটা দীর্ঘকাল থাকা সম্ভবতঃ প্রয়োজন। যে মৃত্যু কার যেন আদেশে 'পঞ্চমে ধাবিত' হয়, তা শংকর চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের মাঝ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর কবিতা আমাদের কাছে থেকে যাবে।

শংকর চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচটি কবিতা

জাগো, জেগে ওঠো

জাগো, জেগে ওঠো প্রস্তরফলক থেকে বৃক্ষ
দিকনাবিকের গূঢ় গাণিতিক রক্তকোষে জাগো
যেভাবে পুরুষত্ব বা প্লাবন জাগে
সেই তীব্র
উচ্চকিত ব্যোম-সভ্যতার গূঢ়
জ্যামিতিক বোধিসত্ত্বে
ভূগোলের ধুরন্ধর বর্ণলিপি
শৃঙ্খলিত জন্ম নক্ষত্রতন্তুর জাল ছিন্ন করে
জাগো
আকস্মিক মর্মছেঁড়া
জেগে ওঠো
ব্যথাহীন আত্মমগ্ন
নিরোগ দেহের মতো
দারুণ প্রাণের মর্মে
শোভাময় বীজ
সর্বাত্মক তীব্র শ্মশানের শিখা
অমর কবির কাব্যে
যেখানে অঙ্গারও দুর্বা
ভূয়া সভ্যতার ও
পৃথিবীর মাংস খুঁটে
জাগো, জেগে ওঠো।

সেই এক

শুরু হবার আগেই যত তত্ত্বতালাস
স্বস্তিপাঠের পর চৌদিক জুড়ে হাঁকপাড়া
নইলে সেই সবই তো এক
ছায়ানাট্যের বীরপুরুষ বা বহু দৃশ্যের নর্তকী
কিংবা সেই কচি সন্ন্যেসীর মাথা নাড়া

সব সেই এক বে-ভুল নিয়মের ঠিকেদারী
পায়ের তলার চেয়ে পথের কাঁটার বেশী শুশ্রূষা।

নতুন ব্রীজের দখল নিতে ছুটে আসছে জলের ধারা
রাজমিস্তিরির কর্ণিক ভাঙছে প্রাসাদের চূড়া
পাহাড়ের গল্প বলা হচ্ছে উরুক্ষু মাঠের কানে
বাগানের বেড়া কাটছে রাশি রাশি জুঁই।

কেউ কি যাচ্ছে নির্ভুল লক্ষ্যে!
নতুন কাগজ টেনে বসাচ্ছে নতুন অক্ষর
ইস্টিশানের গাড়ি ফেরাচ্ছে হা-করা মাঠের দিকে।
সব সেই এক বে-ভুল নিয়মের ঠিকেদারী
স্বস্তিপাঠের পর চৌদিক জুড়ে হাঁকপাড়া।

তবু বন্দী

আজ একাকার সব
মুছে···ভেসে···নিরুদ্দেশ
তবু হৃদয়ের কাছে বন্দী সকলেই
ঠুঁটো পাগলের কিন্তু ভক্তি নেই
এই ব্যথা এই বা উল্লাস
যেন সলিতার বাস্তবতা
তার কাছে
বিপ্লবও রক্ষণশীল কড়ে রাঢ়ী।

তবু তুমি কাজ করে যাও
হৃদয়ের যা যা কাজ
নারী হলে গৃহকর্ম করো
প্রকৃত পুরুষ যদি ব্যাধের মতন হানো ব্যথা।

কেননা মানুষই জানে
ফাঁকি বা মোহের মতো হৃদয়েরও কুঁজ কিংবা গলগণ্ড আছে
আছে ভাড়ারের ঘট

বর্ণলিপি
জীবিকানির্বাহ
শুধু নেই গহ্বরের ভয়।

বহুদিন মানুষের তাই যাতায়াত তার কাছে
তার কাছে কাস্তে বা কার্পাস নত
বাস্তবতা নত।

ঠুঁটো পাগলের শুধু ভক্তি নেই
সে জানে ভূতের কাছে মরণের কতটুকু দাম।

তবু হৃদয়ের কাছে বন্দী সকলেই
তবু বন্দী
শুবরে পোকার মতো সকলেই
গভীরে হঠাৎ নেমে ওম পেতে যায়।
তবু
প্রতীকী ক্রুশে হরিৎ আলো আবছা হয়ে পিছলে পড়ে
তৃণপর্ণে ক্লান্ত কিশোর ঘুমিয়ে
অঞ্জলি পেতেছে পথিক
তার পলাকাটা চোখে
এক বিচ্ছেদ
কত মানুষ হারিয়ে হয়েছে রাস্তা আর ফুলচন্দন আর পাহাড়চূড়ার গোধূলি
সকলই অর্জন
যেমন জলের বিম্ব, জলের উদয়
তড়িৎপুঞ্জের মতো চলাচল
কি নাগী, কি পন্নগী, কি প্রকৃতির
দিকনির্ণয়ের খেলা
অনুগমন।

অনিবার্য পূর্ণতাই লক্ষ্য
মূল ছেড়ে বেড়ে ওঠা বীজাঙ্কুরের তেজ
জড়পিণ্ডের স্মৃতি
মাত্রাশূন্য।

তবু পথ ও গন্তব্যে কোন বিভেদ নেই
বিচ্ছেদ নেই প্রাণী ও উদ্ভিদে
সকলের আত্মাকে যজুঃ সাধ্য
অন্নায় করে
স্থির দুঃখ, প্রগাঢ় প্রকৃতি
তবু তৃণপর্ণে ক্লান্ত কিশোর ঘুমোয়
অঞ্জলি পাতে পথিক
প্রতীকী ক্রুশে হরিৎ আলো আবছা হয়ে পিছলে পড়ে।

রোজ যখন

ভুতুড়ে আঁধার যায় চলকে—আমি টলোমলো বিছানার দিকে এগুই
তখন আমার গা'ময় ধুলো, চোখের মণি অসাড় আর মস্তিষ্ক পাথর
তখন শ্বাস নিতেও কষ্ট তেষ্টা ভুলতেও কষ্ট।
বিছানায় কিন্তু দেওয়ালীর উৎসব—জোনাকির ওড়াওড়ি
হারামখোর ঘেয়ো বিড়ালটা ফোঁসফোঁসাচ্ছে
আর সারা বাড়িটা এক ঘুমেই কাদা।
ভেতরে বুকের বাঁদিকটায়
রোজ আমি যখন বিছানার দিকে এগোই তখন সারা বাড়িটাই পাথর
সব রলরোল শান্ত আর
শংকর তখন একলা, ঘুমে ঢুলছে
বুকের বাঁদিকটায় শংকর ঢুলছে, অবিশ্রাম ঢুলছে।

প্রস্তুতি ছাড়াই

প্রস্তুতি ছিল না তবু উড়ে আসে কার্পাস বীজ
নীল ছড়িয়ে যায় নীলে
টের পাই সময় হয়েছে।
প্রবাসে যেমন বেলা ফুরোলেই ঘরে ফেরা
ইঁট গেঁথে তুললেই বাড়ি

তেমনি আমারও সময় হয়েছে
সটান হাত পা উল্টে ডুব
তার সাত সাঁতারে কাজ নেই।

পাঁজিতে তো আর দিনের শেষ লেখে না
সব ভোজেই কী আর নিমন্ত্রণ হয় হে?
এখন সময় হয়েছে
আর সাত সাঁতারে কাজ নেই, হাত পা উল্টে এবার সটান ডুব।

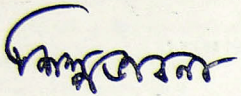

শিল্পভাবনা

গ্রাহাম সাদারল্যাণ্ডের চিত্র-ভাবনা

নৃপেন্দ্র সান্যাল

ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আবহাওয়ার মতো শিল্পক্ষেত্রেও বস্তুত রক্ষণশীলতার প্রভাব। এ আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট হয়েও গ্রাহাম সাদারল্যাণ্ড, জন্ম ১৯০৩ সাল, এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। যদিও, সাদারল্যাণ্ড মুখ্যত নিসর্গের চিত্রকর হিসেবে অভিহিত, কিন্তু তা মাত্র আংশিক সত্য। নিসর্গ তাঁকে অভিভূত করেছে অবশ্যই, এবং তাঁর মনকে আচ্ছন্নও করেছে—কিন্তু তাঁর চিত্রগুলি ব্যক্তি ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বস্তুর মধ্যে যে-বিভেদ, তারই এক অভিনব সেতুবন্ধন। এই প্রসঙ্গে সাদারল্যাণ্ডের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি নিজের ছবির বিষয়ে লিখেছেন: 'আমার ছবি আঁকার বিষয়বস্তু আমার চৈতন্যের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে রূপ পায়—আমি বস্তুকে সেই চেহারায় আঁকতে চাই, যে-চেহারা আগে কেউ কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। আমার ভাবনায় ঘুরে-ফিরে-আসা বস্তু ও ঘটনাগুলি আমার চেতনায় স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকে। সেই সমস্ত স্মৃতি আমি বর্তমানে যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তার সঙ্গে মিশিয়ে নিই। আমার ছবি এই রসায়নেরই প্রকাশ।' প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা—দৃষ্ট বস্তুর পিছনে রয়েছে এক অদৃষ্ট সত্তা, প্রকৃতির উপরে এক অতি প্রাকৃতের উপস্থিতি। এবং এই ধারণা তাঁর গড়ে উঠেছে ইংলণ্ডের সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তার কারণে।

সাদারল্যাণ্ডের শৈশব কাটে সারে এবং সাসেক্সে। স্কুল-জীবনের আরম্ভ সাটন-এ। এবং প্রায় সেই সময় সোয়ানেজ-এ এক ছুটি কাটানোর সময়, সাদারল্যাণ্ড নিজেই বলেছেন, তাঁর সঙ্গে প্রকৃতির প্রথম পরিচয় ঘটে। এই

পরিচয়ই উত্তরকালে তাঁকে প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন ঘনিষ্ঠতায় আবৃত করেছিল। চিত্রকরের পক্ষে এই ঘনিষ্ঠতা সব সময় শুভ নয়। তার কারণ, এই ঘনিষ্ঠতা অচিরেই তাঁকে দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুতে সীমিত করে রাখে। কিন্তু আশ্চর্য, সাদারল্যাণ্ডের জীবনে সেই ঘোর লাগে নি। যদিও সাসেক্সের সবুজ, পাতার ভারে নুয়ে পড়া গাছ, সোয়ানেজের দিগন্তে সাদা, কালো ও সবুজ রেখায় মিশে জনপদ এই সময়েই তাঁর চোখে গভীর ছায়া ফেলেছিল। তিনি স্পষ্টই দেখেছিলেন তখন, ঢেউ তোলা ঘাসের শিয়র, শির তোলা গাছের পাতা, গাছের শরীরে জরার রুক্ষ রেখা। জীবনের এই পর্যায়ের অভিজ্ঞতা সাদারল্যাণ্ডকে পরবর্তীকালেও চঞ্চল করেছে।

স্কুলের সীমানা পার হয়ে ১৯১৮ সালে সাদারল্যাণ্ড এলেন ডার্বি শহরে। মিডল্যাণ্ড রেলওয়ের কাজ নিয়ে। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে সেখান থেকে অব্যাহতি নিলেন। যদিও কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছবি আঁকার তৎকালীন অনুশীলন তাঁকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছিল। তার সাক্ষ্য তাঁর পূর্ণতাপ্রাপ্ত পরবর্তী কালের ছবিগুলি। যেমন **Boulder, Western Hills,** অথবা **Red Landscape.** ডার্বি শহরে তাঁর অবস্থিতিই তাঁকে পাকাপাকিভাবে চিত্রকর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে প্রবুদ্ধ করে। তা-না হলে, কে জানে, সাদারল্যাণ্ড হয়তো রেলওয়ের অন্যতম ইঞ্জিনিয়ার হয়ে জীবন শেষ করতেন।

শুধু অভিজ্ঞতা অথবা সদিচ্ছাই যে যথেষ্ট নয়, একথা সাদারল্যাণ্ড গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে অনুভব করেছিলেন। তিনি নিউ ক্রসে এসে গোল্ডস্মিথস্ স্কুল অব আর্টস-এ ভর্তি হলেন। এবং ১৯১৯ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত—এই ছ বছর এইখানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষান্তে তাঁর চিত্রকর জীবনের প্রথম শুরু এচার হিসেবে। এচিঙে তাঁর খ্যাতি এমনই প্রসারিত হল যে তিনি চেলসি স্কুল অব আর্ট-এ শিক্ষক নিযুক্ত হলেন।

নিউ ক্রসে থাকার সময়েই সাদারল্যাণ্ড আশে-পাশের গ্রামে বেড়াতে যেতেন। সেখানকার নিসর্গ তাঁর শৈশবস্মৃতিকে উন্মুক্ত করতো। রঙে এবং রেখায় সেই স্মৃতির চেতনাকে কি করে ধরে রাখা যায়, তখন ছিল তাই তাঁর আপ্রাণ প্রয়াস।

১৯৩০ সাল পর্যন্ত সাদারল্যাণ্ডের নিজস্ব কোন অঙ্কন রীতি গড়ে ওঠেনি। তাঁর ছবিতে অবশ্য অনেকেই তখন ফরাসী প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু এ নেহাৎই আরোপ করা। বরঞ্চ বলা যায় পাসার এবং টার্নার—ইংলণ্ডের এই দুই বিখ্যাত চিত্রকরের মতোই সাদারল্যাণ্ডের চিত্র-প্রচিন্তার উৎস নৈসর্গিক দৃশ্য। টার্নারের

মতোই তাঁর বস্তু থেকে অ-বস্তুতে উত্তরণ। কিন্তু টার্নার চেয়েছিলেন প্রকৃতির আত্মাকে খুঁজে বার করতে। কিন্তু এই প্রয়াসে কোন দার্শনিক বোধ ছিল না। ছিল রহস্যবাদের প্রভাব। যার কিছু আভাস পাওয়া যায় ওয়র্ডস্বর্থ ও কোলরিজের মধ্যে। খুঁজলে হয়তো শেলিং-এর মধ্যেও এর মিল পাওয়া সম্ভব। একশ বছর পর সাদারল্যাণ্ড এক নতুন দার্শনিক অভিধা তৈরী করলেন তাঁর চিত্র-চিন্তার জন্য। কষ্ট কল্পনার কিছু ঝুঁকি নিয়েও বলা যায় সার্ত্র-এর মতোই সৃষ্টি-জগতের বিক্ষোভ তাঁকে উত্তাল করেছিল। তাই প্রাকৃতিক বস্তু তাঁর চিত্রে আর দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুই শুধু রয়ে গেল না। প্রতীক হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হল।

টার্নার নিজের চিন্তাকে সুসংবদ্ধ করে অভিব্যক্তিবাদের সূচনা করলেন। কিন্তু সাদারল্যাণ্ড ভিন্ন পথ ধরলেন। টার্নারের মতোই প্রকৃতি তাঁর আবেগকে উজ্জীবিত করতো, প্রেরণা যোগাতো। কিন্তু শেষ বিচারে তাঁর পরিণতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সাম্প্রতিক ইংরেজ চিত্রকরদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সাদারল্যাণ্ড এক বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। গতানুগতিক চিত্র-চিন্তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে এক বিশেষ পরিণতির দিকে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছেন। যতই তিনি প্রাপ্ততা অর্জন করেছেন, ততই দেখা গেছে বস্তু ও বস্তু-নিরপেক্ষ জগতের মধ্যে ব্যবধান তাঁর কাছে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। ১৯৩৬ সাল নাগাদ, সুদীর্ঘ পনের বছরের অনুশীলনের পর তাঁর নিজস্ব একটি অঙ্কনরীতি গড়ে ওঠে। তার নিশ্চিত প্রথম প্রকাশ দেখা যায় পেসব্রোকশায়ারে।

সেখান থেকে কলিন এণ্ডারসনকে যে-চিঠি তিনি লিখেছিলেন তা প্রণিধান-যোগ্য।

'এখানে চুপ করে বসে নিসর্গের দৃশ্য অঙ্কন আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমার ধারণা ছবি আঁকার পক্ষে কোন তৈরী বিষয় থাকে না। বাইরের জগতের বিন্যাস যা আমরা দেখি, তা মনে সঞ্চয় করে রাখার উপাদান। এদের অন্তর্নিহিত অংশটুকু বুদ্ধিগ্রাহ্য, হয়তো সেগুলি আবেগকেও ছুঁয়ে যায়। তাই বোধহয় আমার ছবি কখনোই প্রকৃতির যথার্থ চিত্রায়ন হয়ে ওঠে না।' হয়তো এই কারণেই সাদারল্যাণ্ডের ছবিকে বলা হয়: প্রকৃতির 'ভাষ্য' অথবা প্রকৃতি সম্পর্কে চিত্রকরের 'মন্তব্য'। কারণ তাঁর পরিণত চিন্তাধারায় চৈতন্য ও বস্তুর মধ্যে ব্যবধান কেটেছে। প্রকৃতিই তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে বিশ্লিষ্ট ও সংগঠনবিহীন ভাবে।

এই পরিবর্তিত মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সাদারল্যাণ্ডের ১৯৩৬-৪০ সালের

রচিত চিত্রগুলি দ্রষ্টব্য। তাঁর 'রেড ট্রি,' 'রকি ল্যাণ্ডস্ক্যাপ উইথ কেয়ারন', 'দি গ্রীণ ট্রি ফর্ম', 'দি ব্ল্যাক ল্যাণ্ডস্ক্যাপ', 'ল্যাণ্ডস্ক্যাপ উইথ লো ক্লিফ অ্যাণ্ড উডস' এবং সেই বহু বিতর্কিত 'গোর্স অন সি ওয়াল'—এই সময়েরই কাজ।

এই কাজগুলি প্রত্যক্ষ করলেই উপলব্ধি করা যায় সাদারল্যাণ্ড নিজের সম্পর্কে কতখানি সচেতন। এই কাজগুলি সম্পর্কে মোটামুটি তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করেই বলা যায় **suddenly seen and vvidly remembered.** এই সব ছবির ফর্ম উল্লেখযোগ্য এবং কনটেণ্ট হিসেবে রঙের ব্যবহারও লক্ষণীয়। এখানেই তাঁর যেন নিশ্চিত পদক্ষেপ। বিমূর্ত রীতির পথে ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া। ১৯৩২ সালে আঁকা (সারভেজ ইত্যাদি) এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। রঙ সম্পর্কেও সাদার-ল্যাণ্ডের হাত ছিল উদার। সবকটি প্রাথমিক রঙেরই ব্যবহার তিনি করেছেন। বিশেষ করে লাল এবং হলুদ। নীল অংশই অপেক্ষাকৃত কম। তবে সব কিছুর ওপরে চাপানো হয়েছে কালো। এই রঙগুলির ব্যবহার থেকেই সাদারল্যাণ্ডের অস্থির মানসিকতা, বিক্ষোভ ও অশান্তির একটা আভাস পাওয়া যায়। এই সময়কার পাহাড় বিষয়ক চিত্রগুলি (সান সেটিং বিটুইন হিলস্, ডার্ক হিল ওয়েস্টার্ণ হিল প্রভৃতি) দেখলেই বোঝা যাবে মানুষ ও বস্তু তখন তাঁর কাছে প্রভেদ উত্তীর্ণ। বস্তুতে তিনি জীবন্ত সত্তার উপস্থিতি অনুভব করেছেন। চিত্র রচনার ক্ষেত্রে এই মৌল বোধ, অনুশীলন নয়—বহুদিনের চিন্তা ও ভাবনার ফল। পার্থিব-তার গভীরে তিনি প্রবেশাধিকার অর্জন করেছিলেন। জীবনের ব্যর্থতা ও কদর্যতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আন্তরিক এবং ঘনিষ্ঠ। সুন্দর ও স্নিগ্ধ বহিরঙ্গ তাঁকে তাই তেমনভাবে কখনো আলোড়িত করেনি। পৃথিবী সম্পর্কে এই বোধই তাঁর অধিক মাত্রায় কালোরঙ ব্যবহারের কারণ। সময় সময় মনে হওয়া স্বাভাবিক, কালো রঙ তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে কালোর বিভিন্ন মাত্রার ব্যবহার তাঁর ছবির বিষণ্ণতা ও আশাহীনতাকে সুচিহ্নিতও করেছে।

সাদারল্যাণ্ডের ভাবনায় ব্ল্যাক ও পামারের প্রভাবও কিছু কম নয়, অন্ততঃ পামারের। তাঁর ছোট ছোট কয়েকটি ছবিতে পামারের আবেদন অনুভব করা যায়।

'ব্ল্যাক ল্যাণ্ডস্ক্যাপ', 'ডার্ক হিল' ইত্যাদি চিত্রের কোন কোন অংশে পার্থির ডানা, অথবা বিরাট কোন পোকার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই ছবিগুলি তাঁর মানসিকতার উদাহরণ। প্রকৃতি অখণ্ড, সে-কারণেই প্রকৃতির এক অংশ

আর এক অংশকে অনুকরণ করে। মানুষ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাই। একে অপরের শুধু অনুকরণই করে না—পরিপূরকও।

প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যের সন্ধানে অধিকতর আগ্রহী তাঁকে মনে হয় ১৯৪০ সালের পরবর্তী কালের আঁকা ছবিগুলি দেখে। 'ট্রি ফর্মস', 'টিন মাইনস্' 'এ ডেক্লিভিটি', 'ফোল্ডেড হিলস্', 'ফারনেসেস', 'ব্লাস্টেট ওকস', ও 'ক্লিফট রোড' ছবিগুলি এ প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ।

প্রায় একই সময়ে (১৯৪৫-৪৬) সাদারল্যাণ্ড তেলরঙে দুটি ভিন্নধর্মী ছবি আঁকেন। ছবি দুটি হল 'থর্ন হেডস্' ও 'হেড অব থর্নস্'। প্রথমটির প্রেক্ষাপটের মেজাজ আনার চেষ্টা হয়েছে হালকা নীল ও সাদা দিয়ে। এবং এই মেজাজেরই পরিপূরক হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন কমলা রঙ। কালোর পরিবর্তে গাঢ় নীল। দ্বিতীয়টির প্রেক্ষাপটও নীল, তবে গাঢ় নীল। সামান্য গাঢ় লাল এবং কালোর বদলে খয়েরি। সাদা এখানেও পরিপূরক রঙ। রঙের ঘনত্বকে হালকা করতে ব্যবহৃত হয়নি। এ দুটি ছবি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক সমালোচকই তাঁর গোত্রান্তর ঘটেছে বলে রায় দিয়েছেন। খুঁজে পেয়েছেন সুরিয়ালিজমের ঝোঁক।

১৯৪৪ সালে সাদারল্যাণ্ডকে নর্থহ্যাম্পটনের গীর্জার অলঙ্করণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখানে তিনি 'ক্রুশের উপর যিশু'—এই চিত্রটি আঁকেন। এই চিত্রের সঙ্গে গ্রুণওয়াল্ড (১৪৭৫-১৫৩০)-এর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এ থেকে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে যে গীর্জার কাজে হাত দেওয়ার আগে তাঁর অঙ্কনের বিষয়বস্তু নিয়ে যথেষ্ট অনুশীলন করেছিলেন। এবং দুজনের চিত্রের এই আপাত সাদৃশ্যের কারণ দুজনের মানসিকতার মিল। খৃষ্টের কাঁটার মুকুট দুজনের চিন্তাকেই প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। সাদারল্যাণ্ড এই কণ্টক গুচ্ছের সঙ্গে প্রাকৃতিক বহু বস্তুর কাঠামো ও গড়নের যে-মিল খুঁজে পেয়েছেন, সেগুলি বিভিন্ন সময় তাঁর বিভিন্ন ছবির বিভিন্ন চিত্রের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সাদৃশ্যগত বস্তুগুলি প্রতীক হিসেবে স্থান পেয়েছে।

সাদারল্যাণ্ডের আলোচনায় হেনরী মুর প্রসঙ্গত এসে পড়েন। কারণ, এক অর্থে এই দুজন সমগোত্রীয়। তাঁরা দুজনে একত্রে একটি সম্পূর্ণ পৃথিবী রচনা করেছেন। সাদারল্যাণ্ডের ফর্ম শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় প্রকৃতির 'টিকা' হিসেবে। মুরের মানুষের ড্রইং তাঁর প্রকৃতি-তত্ত্বের উদাহরণ। সাদারল্যাণ্ডের আঁকা নৈসর্গিক দৃশ্যে যদি মানুষের আবির্ভাব ঘটতো তবে সেই মানুষগুলি অবশ্যই হতো ফাঁপা ও সঙ্কুচিত মস্তকবিশিষ্ট। হেনরি মুরের ভাস্কর্যের মতোই।

মুরের মতো সাদারল্যাণ্ড মনে করতেন মানুষ অথবা তার পরিপার্শ্ব কেউই একে অপরের সম্পর্কে সদয় নয়। সুন্দরের মধ্যেই অসুন্দরের স্থিতি। সাদারল্যাণ্ড ও মুর এঁরা দুজনে যেন দু'প্রান্ত থেকে একই আশ্রয়ে মিলিত হয়েছেন। পৃথিবীর আগুন আর ছাই এই আশ্রয়।

সাদারল্যাণ্ডের মানসিকতা প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন অবস্থা জানা অনিবার্য। দুটি মহাযুদ্ধেরই মধ্য দিয়ে তিনি পরিণত হয়েছেন। ১৯৪০-এর পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত ওয়েলস্, যেখানে তাঁর শৈশব কেটেছে, দেখলেন এবং সহসা তিনি বিধ্বস্ত প্রকৃতির মধ্যে তাঁর জগতের সন্ধান পেলেন। এর পরই এল তাঁর চিত্রে নাটকীয়তা। ১৯৪০-৪১ সালে তাঁর আঁকা ধ্বংসের ছবিগুলি ভয়াবহকরভাবে নির্ভুল।

এই ধ্বংসেই সাদারল্যাণ্ড আবদ্ধ থাকেন নি। তিনি দেখলেন যুদ্ধ করে মানুষ। মানুষই মানুষের নির্মম ব্যবহারের যন্ত্র। এই নির্মমতা কোন না কোন সময়ে কুৎসিত আকৃতি নিয়ে দেখা দেবেই। এবং তার দেখা পাওয়া গেল 'টেপিং এ স্টিল ফার্নেস' চিত্রে। সম্ভবত এটি সাদারল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। প্রকৃতির যে রহস্য সাদারল্যাণ্ড তাঁর আঁকা নিসর্গের চিত্রে আবিষ্কার করেছিলেন, সেই কালো এবং ধূসর বিষণ্ণতা, তা আবার ফিরে এল তাঁর অন্যান্য চিত্রে যেখানে মানুষ উপস্থিত। তাঁর লোহার কারখানার কর্মীরা যেন 'মুখ বিহীন'। খনি কর্মীরা যে ধাতব বস্তু গলাচ্ছে, তারাও যেন তাই দিয়েই তৈরী। এই সমস্ত ছবির মানব অবয়বের ড্রইং দেখলেই মনে হয় সেগুলি শক্ত কিন্তু শঙ্কিত।

এই পর্যায় থেকেই প্রকৃতি থেকে সাদারল্যাণ্ড সরে আসেন ফিগারেটিভ মোটিভে। (রেড গ্রাউণ্ড ১৯৬২) তিনি প্রকাশ করতে চাইলেন ফর্ম ও মেজাজে শঙ্কা, অপ্রাকৃত সত্তার ভয়াবহ অস্তিত্ব। এই বোধ তাঁকে বহুদিন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

পরে হয়তো তিনি এ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। তাই সম্ভবত তাঁর পরবর্তীকালের কাজগুলিতে অলঙ্করণ এবং মোটিভের প্রাধান্য।

পূরবী

নজরুল ইসলামের "ধূমকেতু"

কাণার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে

[কাজী নজরুল ইসলাম]

যে কাপুরুষ সেই শুধু নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপায়। নিজের দুর্ব্বলতার দরুণ সবলের জবরদস্তীকে "অন্যায় অন্যায়" ব'লে কান্নাকাটি করা একটা 'ট্রেড মার্কা' মেয়েলী ঢং। যাকে অন্যায় ব'লে মনে কর, বুক ফুলিয়ে তাকে অন্যায় বল; দেখবে—অন্যায়ের মুখ কালো হয়ে যাবে। যাকে অন্যায় মনে কর, তাকে বিনাশের জন্যে তোমার বজ্র-আঘাত অগ্নিবাণ নিক্ষেপ কর, দেখবে—অন্যায় আপ্‌নি 'গায়েব' হ'য়ে গেছে। অন্যায় যদি তোমার বিষম আপত্তি সত্ত্বেও তোমার নাকের ডগায় ধেই ধেই ক'রে নাচে আর কলা দেখায়, তা হ'লে বুঝতে হবে যে অন্যায়-বাঁদর তোমার 'মুরোদ' যে কতটুকু তা বেশ জেনে নিয়েছে। তুমি যে তার কচুও ক'রতে পারবে না, তা জেনেই সে তোমার মুখের সাম্‌নে অমন ক'রে 'চাটু' নাড়ছে। মাজা-ভাঙা-রগ্‌-ঢিলে তুমি একজন ডাকাত-বুকোতের হাত থেকে তোমার চোরাই মাল ফিরিয়ে পেতে চাইলে আগে তাকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা ক'র্‌বার পাঁয়তারা ভাঁজা আর কায়দা-কানুন শিখ্‌তে হবে। তা না হ'লে দাদা ও-কান্নাকাটিতে ব্যাটা ছেলের মন ভিজ্‌বে না। দাঁও কস, প্যাঁচের পর প্যাঁচ দিয়ে ডাকাত বাছাধনকে যদি একবার ধরা-সই ক'র্‌তে পার, তা হ'লে সে বাপ বাপ ব'লে তোমার চীজ তোমায় ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু ঐ পিলু বারোঁয়ায় "প্রাণ আর বাঁচে কেমনে" ক'রে কাঁদ্‌লে আরো তাল-ধুমাধুম প'ড়বে তোমার জুতোর আলপনা-আঁকা পিঠে মুখে।

তোমরা চাচ্ছ স্বরাজ, অর্থাৎ স্বাধীনতা। অর্থাৎ কিনা বাঙলা ক'রে ব'লতে গেলে বোঝায়, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুদের ও-ই সাত-সমুদ্দুর তের নদী পার ক'রে তেপান্তরের মাঠে খেদিয়ে খুয়ে আসা! কথাটা শুন্‌তে খুব মিষ্টি—এই মিষ্টি যে, ও-কথাটা কেউ পাকে-প্রকারে ব'ললেও অমনি খুশীতে বাগেবাগ হ'য়ে 'কাছা খুলে বাহু তুলে' উৎরিঙ্গে-নাচ সুরু ক'রে দিই, আর যে-সে কথা বলে তাকে ত ড্যাং-তুলো ক'রে কাঁধে না তুলে ছেড়েং-ডেড়েং ডেড়েং-ডেড়েং ক'রে বোধনের বাজনা বাজিয়ে দিই যে, ভগবান এসেছেন। কিন্তু সেই ভগবান যখন বলেন যে, দেশের পায় তোমাদের স্বার্থকে বলিদান দাও, অম্‌নি তোমাদের ব'লকে-ওঠা ভক্তি-দুগ্ধ ছিঁড়ে এমনই ট'কো দই / ৩ / হ'য়ে ওঠে যে, কার বাবার সাধ্যি তা জিভে ঠেকায়! এই ভাবের কুলকুচি দিয়ে ভূত ভাগাবে মনে ক'র্‌ছ, কিন্তু যেই ভূত দাঁত খিঁচিয়ে নখ উঁচিয়ে একটু আঁচড় কামড় বা গতিক বুঝে গোটা দুচ্চার কিল কসিয়ে দেবে, অম্‌নি তোমরা মায়ের আঁচল-ঝাঁপা ছেলে মায়ের আঁচল আড়ে লম্বা দেবে আর ব'ল্‌বে, ভয়ানক অন্যায়! এমন ক'রে পরের ভাতে বেগুন পোড়ানোটা ধর্ম্মে সইবে না। কিন্তু ধর্ম্মে যখন সইছেই, তখন ব'লতে হবে বৈ কি, যে, জবরদস্তীর ধর্ম্মের এমন একটা আবরণ আছে যা কোনো দেবতার অভিশাপই ভেদ ক'রতে পারে না।

এর মানে কি, জান? যে ধর্ম্ম মানুষকে এত অধার্ম্মিক করে, এত পায়ের তলায় এনে ফেলে, সে ধর্ম্ম-বালখিল্যের ভিতর অনেক কিছু গলদ আছে। সিংহের চামড়ার ভিতরে গাধা লুকিয়ে আছে। দোষ আমাদের। আমরা ধর্ম্ম ধর্ম্ম যতই করি, ধর্ম্ম আমাদের নেই। ধর্ম্মপূজারী হ'চ্ছে সত্যের পূজারী; সত্যের পূজারী কখনো কাপুরুষ হয় না। অন্তরে এত অধর্ম্মের আখ্‌ড়াই, আর বাইরে ধর্ম্মের ফুটো ডুগ্‌ডুগি পিটুলে কি কেও ভয় পায় দাদা? "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" কথাটা মান্ধাতার আমলের পুরাণো হ'লেও বেজায় সত্যি। ইংরেজ এদেশ অধিকার ক'রে আছে কেন, ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে না কেন ব'লে মাথা খুঁড়লে চুল ছিঁড়লে ইংরাজ-রাজ অনুতপ্ত হ'য়ে তোমাদের হাতে ভারত ছেড়ে দিয়ে পরাচিত্তি ক'র্‌বে না। ওরা বীরের জাত, ওদের কাজ-কর্ম্ম সব মদ্দা রকমের। তোমাদের এই চিঁ-চিঁ শব্দের কাতুকুতু-খোঁচানীতে তারা তোমাদের আরো ক'সে দাব্‌বে। তেরীয়া হ'য়েছ কি, সোজা প্রক্রিয়া—'দে ধনাধ্বন্ মার ধনাধ্বন্!' এই ধনঞ্জয়ের জোরেই ব্যাটা ছেলে তারা তোমাদের তুলোধুনো ক'রে ছেড়ে দিচ্ছে। ওদের দোষ দিচ্ছি, কিন্তু আমরাই যদি ওদের বিলেতে গিয়ে রাজা হ'য়ে ব'সতুম, আর বিলিতী

লোকগুলো আমাদের কাছে এই রকম আব্দার ক'রত, তা হ'লে আমরা তাদের প্রত্যেককে ধ'রে ধ'রে ডুগ্‌গা ব'লে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিতুম। আণ্ডা বাচ্ছা কাউকে ছাড়তাম না। তা তোমরা যতই কেন প্রেমের পাগল-ঝোরার দেশের লোক হও। তোমরা যে কত বড় কসাই-এর জাত, তা তোমাদের জমিদার আর বড়লোকদের দিকে চেয়ে দেখলেই বুঝ্‌তে পারবে। তোমাদের যদি সত্যিই কিছু ক'রবার শক্তি থাক্‌ত, তা হলে কাঁদুনী না গেয়ে যা ক'রবার তা সোজা ক'রে যেতে। একটী কথাও কইতে না। ব্যাটা ছেলেকে ব্যাটা ছেলের মত বুক ঠুকে যদি 'চ্যালেঞ্জ' ক'রতে, তা হ'লে তোমাদের স্বরাজ-লাভের আশা থাক্‌লেও থাক্‌তে পারত। আর এতে হারলেও তোমাদের অপমান হ'ত না। বীরের কাছে বীরের পরাজয় সম্মানের। আলেকজাণ্ডার আর পুরু রাজার কথাটা মনে ক'রে দেখ। তারা দেশ জয় ক'রেছে, তা যে করেই হোক। এত বড় পৃথিবীর সেরা দেশ, তা কিনা চোখ-রাঙানী দেখে ছেড়ে দেবে! এ কি ছেলের হাতের মোয়া পেয়েছ, সকলের আগে এইবার মেয়েলী ঢং মাদীপনামো ছেড়ে ব্যাটা ছেলে হও,—আসে অহঙ্কার আসুক, আসুক দম্ভ, আসুক গর্ব্ব, তবু আর এ-সব কাতুকুতু-ভাব সহ্য হয় না। চুলোয় যাক তোমার বিনয়, পায়ে মাড়িয়ে যাও, লোকদেখানো ভদ্রতা, মার ঝ্যাঁটা তোমার ঐ সখি-ধর-ধর ভাবের ওপর, তুমি ব্যাটাছেলে হও, মর্দ্দ-পুরুষ হও।

"গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা পুরুষ হ!"

এমন ক'রে, নিজের ক্লীবতার জন্যে অন্যকে দোষ দিয়ো না। ভগবান আমাদের দেশকে এই মেয়েলী মায়ার যাদু হ'তে মুক্ত করুন। / ৪ /

দ্বিতীয় সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩০শে শ্রাবণ ১৩২৯

পুরুষের মুখে মেয়েদের কথা বা ভূতের মুখে রাম-নাম

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

পুরুষালী-মেয়ে যে একটি অদ্ভুত জীব, একথা সত্য হ'লেও মেয়েলী-পুরুষ যে আরো অদ্ভুত, এর প্রমাণ দেবার জন্যে আমাদের বেশী দূর যেতে হবে না নিশ্চয়।

কিছুদিন থেকে বাঙলায় এক শ্রেণীর পুরুষ মেয়েদের স্বাধীনতা দেবার পক্ষে যেখানে-সেখানে তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। আমরাও এতদিন আমাদের মা-বোনদের "নারীরা দেবী" এ কথা ব'লে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলুম। তাঁরাও আমাদের দেওয়া সে সম্মানকে "বুকের কি মাথার" তা বিচার না ক'রে

এতদিন নির্ব্বিবাদে নীরবে শ্লাঘার সঙ্গে ব'য়ে আসছিলেন। কিন্তু এ যুগটা নাকি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার যুগ, তাই জগতের সর্ব্বদেশের নারীর মধ্যেই একটা জাগরণের তীব্র সাড়া প'ড়ে গেছে। কাজেই আমাদের মা-বোনরাও যে ঘুম থেকে জেগে উঠে তাঁদের সত্যিকারের অধিকারটা দাবী ক'রে বসবেন, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু আছে ব'লে মনে হয় না।

কিন্তু মজা এই যে, আমরা আমাদের ঐহিক সুখ-ভোগের লোভে তাঁদের এ জাগরণটাকে যে খুব একটা ভালো চোখে না দেখে একটা বিশেষ অশিষ্টতার পরিচায়ক ব'লে মনে ক'রব, এটা বলাই বাহুল্য। কেন না, এদেশের মেয়ের মত বিনি মাইনের এমন সেবা ক'রতে আর তো কেউ পারে না। কাজেই তাদের ন্যায্য গণ্ডা বুঝিয়ে দিতে যে, আমাদের বুকে বাজবে এটা বলাই বেশী। যে অধিকার আমরা সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ীর আমল থেকে নির্ব্বিবাদে ভোগ-দখল ক'রে আসছি, সে অধিকারটা ছেড়ে দিতে যে আমাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকলেও যে অধিকারের ভিৎ অন্যায় অবিচারের উপর দাঁড়িয়ে, তা একদিন প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে ভেঙে প'ড়বেই—তাকে ঠেকা দিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র।

ফলে যেই মেয়েরা একটু একটু ক'রে তাদের দাবীর চিঠি বাঙলার পুরুষ-সমাজের সুমুখে উপস্থাপিত ক'রতে যাচ্ছে, অমনি পুরুষের দল চেঁচিয়ে চিল্লিয়ে গলা ফাটাতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন—সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল! মেয়েরা পশ্চিমের হাওয়ায় একেবারে বিবি ব'নে গেছে। তাতে ক'রে সনাতন সমাজ আর টিঁকছে না। ভয়, পাছে মেয়েরা হেঁসেল ছেড়ে দেয়। আঁতুড় ঘরে ঢুকতে সম্মত না হয়, তবেই তো মুশকিল!

আমরা একথা ব'লছি নে যে, বাঙলার মেয়েরা কেরাণীগিরি করুক, পাহারাওয়ালার কাজে ভর্ত্তি হোক, আমরাও তা চাই নে। আমরা চাই, তারাও মানুষের সব-কিছু অধিকারগুলি পাক। পুরুষ কেন কোন্ অধিকারে তাঁদের দাবিয়ে রাখবে প্রেম খোশ খেয়ালের ঝোঁকে পায়ের তলায়? / ৬ /

শুধু পুরুষেরাই যে মেয়েদের এ জাগরণের বিপক্ষতাচরণ ক'রছেন, তাই নয়, কোন কোন শিক্ষিত বঙ্গরমণীও তাঁদের এই একান্ত শ্লাঘার কারা ত্যাগ করতে সম্মত নন। এঁরা আপন আপন খাঁচাটিকেই বিশেষ ক'রে চিনেছেন!

মেয়েদের এই জাগরণের মুখপাত্রীস্বরূপ যে ক'জন বঙ্গরমণীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, তন্মধ্যে শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, শ্রীমতী সত্যবালা দেবী, শ্রীমতী

তমাললতা বসু ও শ্রীমতী অমিয়া দেবীর নাম করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর লেখাতেই চারিদিকে সাড়া প'ড়ে গেছে। কেননা তাঁর বিনয় আছে যথেষ্ট, তবে ভিখারীর ভাব নেই এতটুকু। আর সেইটুকুকেই বিপক্ষ শিবিরের সেনানীরা ব'লছেন "মেয়ে জ্যাঠা"। সত্যের উত্তাপ সহ্য করা বাঙলার পুরুষ কাপুরুষদের ধাতে নেই। আর সেই কারণেই কোন কোন ভূঁইফোঁড় লেখক এই লেখিকাকে "সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর" মত চারিদিক থেকে বিদ্রূপ আর বাক্যবাণ বর্ষণ ক'রছেন।

এই সব মেয়েদের লেখায় পুরুষালী ভাব নেই মোটেই, আছে উৎপীড়িতের জেগে ওঠার ভাব। কিন্তু যাঁরা তাঁদের দাবিয়ে রাখবার জন্যে আজ কলম উঁচিয়ে ধ'রেছেন, তাঁদের লেখার পিছনে আছে অনেকখানি কাপুরুষতা, সত্যকে গোপন ক'রবার একটা প্রাণপণ চেষ্টা। এঁরা চলেন খোশ্ মেজাজে আপনাদের আঠারো আনা স্বার্থ বজায় রেখে যেখানটায় তাঁদের স্বার্থের এতটুকু কমতি হবে না, সেই বাড়তিটুকু মেয়েদের দয়া ক'রে হাতে ধ'রে তুলে দিতে। কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে, মেয়েদের যা দাবী আজ স্বেচ্ছায় না দিলে, কাল তাঁরা তা সুদ শুদ্ধ আদায় ক'রে নেবেন। হয়তো তখন পাওনার চাইতে বেশীই নিয়ে নেবেন। পৃথিবীতে আজ মুক্তির রক্তপতাকা উড়ছে। আমরা পুরুষরা যদি "স্ব-রাজ" দাবী ক'রতে পারি, তবে মেয়েরা কেন তা সমাজে দাবী ক'রবেন না? মহাত্মাজি ব'লেছেন, অস্পৃশ্যতা দূর না ক'রলে স্বরাজ আমরা পাব না। কিন্তু যাঁরা আপন ঘরের মেয়েদের অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছেন, তাঁদের মুখে স্বরাজের দাবী, ভূতের মুখে রাম-নামের তুল্য। জগৎ জুড়ে আজ স্বাধীনতার হাওয়া ব'য়ে যাচ্ছে, বাঙলার পুরুষ আজ তাকে ঠেকাতে গেলে যে নিজেরা ঠ'কবেন—(যেমন এতকাল ঠ'কে আসছেন) সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই আমরা বাঙলার পুরুষদের আহ্বান ক'রছি, তাঁরা স্বার্থের গণ্ডী ছেড়ে প্রত্যেককে নিজ নিজ অধিকার দিয়ে উদারতার খোলা মাঠে বেরিয়ে পড়ুন—যদি নিজেরা বাঁচতে চান।

পুরুষ এতকাল ব্রাহ্মণের ন্যায় জাতির সমস্ত শক্তি সমস্ত বিদ্যা আত্মসাৎ ক'রে বড় হবেন, এই উদ্দেশ্যই তাঁদের ছিল; কিন্তু এ যুগে বহ্মণ্যের গণ্ডী দিয়ে কারুরই বড় হওয়া চ'লবে না, কেন না সেটা নাকি প্রকৃতির একটা দারুণ ব্যভিচার। তাই পুরুষরাও আজ পুরুষত্ব হারিয়ে সেই দিনের পর দিন ছোটই হ'য়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তবু কি চোখ ফুটবে না? / ৭ /

দ্বিতীয় সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩০শে শ্রাবণ ১৩২৯

তুব্‌ড়ী বাঁশীর ডাক

[কাজী নজরুল ইসলাম]

ঐ শোন—

"পূব সাগরের পার হ'তে কোন্ এল পরবাসী।
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন
হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশী॥

বেরিয়ে এস বেরিয়ে এস বিবর থেকে "অগ্নিবরণ নাগ-নাগিনী" তোমাদের নিখুঁত ফণা দুলিয়ে। ঐ শোন সাপুড়ের তুব্‌ড়ী বাঁশীর ডাক "ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সনসন সনসন"—এসো আমার বিষ-ধর কাল-কেউটের দল! তোমাদের বিবর ছেড়ে বেরিয়ে এস বেরিয়ে এস এই দিনের রৌদ্র-সিন্ধু-কূলে। তটিনীতীরের কেয়ার ঝোপে ঝোপে যারা আজ আত্মগোপন করে আছে সেই নাগনাগিনীদের মনসার পূজাবেদী হ'তে ডাক এসেছে। ঐ শোনো তাঁর দূত বাজায় "ঘনঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সনসন সনসন।" তোমাদের আদিমাতা অগ্নিনাগিনী আজ গগনতলে বেরিয়ে এসেছে, তার পুচ্ছে কোটি কোটি নাগশিশু খেলা করছে, ঐ শোনো তার ডাক ঘনঘন সনসন! ঐ শোনো সাপুড়ের গভীর গুরু গুরু ডম্বরুরব। তারই রবে বিপুল উল্লাসে পুচ্ছ সাপটি উঠেছে দিকে দিকে নাগপুরে নাগ-নাগিনী। অধীর আবেগে বাসুকীর ফণা দুলে' দুলে' উঠছে। বিষুবিয়াসের বিপুল রন্ধ্র দিয়ে তার নাসার বিষ-ফুৎকার শুরু হয়েছে। বেরিয়ে এস—বেরিয়ে এস বিবরের অন্ধকার হ'তে এই রৌদ্রদগ্ধ তপ্ত দিবালোকে হে আমার বিষধর কাল-ফণীর দল! তোমাদের বিষদাঁতের ছোবলে ছোবলে ধরণী জর্জ্জরিত হয়ে উঠুক, তোমাদের অত্যুগ্র নিশ্বাসে নিশ্বাসে আকাশ তাম্রবর্ণ হ'য়ে উঠুক, বাতাসে বাতাসে জ্বালা-দগ্ধ অগ্নি-দাহন হু-হু হু-হু ক'রে ছুটে যাক, তোমাদের কর্কশ পুচ্ছে জড়িয়ে বসুমতীর টুঁটি টিপে ধর। তোমাদের বিষ-জরজর পুচ্ছকে চাবুক ক'রে হানো হানো—মারো এই মরা নিখিলবাসীর বুকে মুখে। বিষের রক্ত-জ্বালায় তারা মোচড় খেয়ে খেয়ে একবার শেষ আর্তনাদ ক'রে উঠুক। খ'সে খ'সে পড়ুক তাদের রক্ত মাংস অস্থি তোমাদের বিষ-তিক্ত চাবুকের আঘাতে আঘাতে। গর্জ্জন কর গর্জ্জন কর আমার হলাহল-শিখ ভুজগ শিশুর দল। বিপুল রোষে তোমরা একবার ফণা তুলে তোমাদের পুচ্ছের উপর ভর ক'রে দাঁড়াও। বিশ্ব

ছাড়ায়ে উঠুক শুধু তোমাদের নিযুত কাল-ফণা নাগিনী আকাশে বাতাসে শুধু দুলুক তোমাদের নাগ-হিন্দোল। পাতালপুরের নিদ্রিত অগ্নিসিন্ধুতে ফুঁ দাও ফুঁ দাও—ফুঁ দিয়ে জ্বালাও তাকে। আসুক নিখিল অগ্নিগিরির বিশ্বধ্বংসী অগ্নিস্রাব, ভগ্নস্তূপে পরিণত হোক এ অরাজক বিশ্ব। ভগবান তার ভুল শোধরাক। এ খেয়ালের সৃষ্টিকে, অত্যাচারকে ধ্বংস করতে তোমাদের কোটি ফণা আস্ফালন ক'রে ভগবানের সিংহাসন ঘিরে ফেলুক। জ্বালা দিয়ে জ্বালাও জ্বালাময় বিধি ও নিয়মকে।

এস আমার অগ্নিনাগ-নাগিনীর দল! তোমাদের পলকহারা রক্তচাওয়ার যাদুতে হিংস্র পশুর রক্ত হিম ক'রে ফেল, তোমাদের বিপুল নিশ্বাসের ভীম আকর্ষণে টেনে আন ঐ পশুগুলোকে আমাদের অগ্নি-অজগরের বিপুল মুখগহ্বরে। আকাশে ছড়াও হলাহলজ্বালা, নীল আকাশ পাংশু হয়ে উঠুক রবি-শশী-তারা-গ্রহ-উপগ্রহ সব বিষদাহনে নিবিড় কালো হয়ে উঠুক, বাতাস খুন-খারাবীর রঙে রেঙে উঠুক। বিদ্যুতে বিদ্যুতে তোমাদের অগ্নিজিহ্বা লক্‌লক্‌ ক'রে নেচে উঠুক, বৈশাখী ঝড়ের দোলায় দোলায় গর্জ্জনে গর্জ্জনে তোমাদের শ্বাস-হুঙ্কার ফুঁসে ফুঁসে উঠুক। ঢালো তোমাদের সঞ্চিত বিষ ঐ মহাসিন্ধু, নদনদীর বারিরাশির মাঝে—টগবগ ক'রে ফুটে উঠুক এই বিপুল জলরাশি—আর তার বুকে তোমাদের বিষবিন্দু বুদ্বুদ হয়ে ভেসে বেড়াক।

আজ "ভাসান"-উৎসবের দিন। মা মনসার পূজাবেদীতে তোমাদের সঞ্চিত বিষ উদ্গীরণের আহ্বান এসেছে। এস—এই ধূমকেতু-পুচ্ছের অযুত অগ্নি-নাগ-নাগিনীর মাঝে কে কোথায় আছ কোন্ বিবরের অন্ধকারে লুকিয়ে হে আমার পরম প্রিয় বিষধর কালফণীর দল! এই অগ্নি-নাগবাসে তোমাদেরও বিষচক্র-লাঞ্ছিত ফণা এসে মিলিত হোক, তোমাদের বিষ-নিশ্বাস প্রশ্বাসে ধূমকেতু-ধূম আরো—আরো ধূমায়িত হয়ে উঠুক!

ঐ শোনো—শোনো—
"ঘন ঘন সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশী।" / ৩ /

ষষ্ঠ সংখ্যা, মঙ্গলবার ১২ই ভাদ্র ১৩২৯

ইসলাম ও এশিয়া

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা প্যান্ ইস্‌লামিজ্‌ম্ শুনলেই আঁৎকে ওঠেন। হিন্দু মুসলমানের একতা সম্ভব এ তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন না, তাঁরা মনে করেন খেলাফত-এর চেষ্টা মহাত্মার একটি চাল এবং যদি শাসনের অবসান হয় তবে হিন্দুগণ বালবিধবার চেয়েও অসহায় হইয়া পড়িবে।

তবে কি সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে একজন না একজন পাহারা-ওয়ালা ধরিয়া আনাই ভারতের ভাগ্যলিপি? এ অবিশ্বাসের কারণ কোথায়?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যত শিক্ষাই প্রদান করুক, একটী বিষয়ে সরকারের বেশ নজর আছে। মুসলমানদের ইতিহাসটা প্রথম হইতেই বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইউরোপে যে তাহারাই জ্ঞান লইয়া গিয়াছিল তাহা আমাদের দেশের হিন্দু বা মুসলমান ছেলে জানে না। যখন ইংলণ্ডে সামান্য ধর্ম্মমতভেদের নিমিত্ত রাণী মেরী শত শত বিভিন্ন মতাবলম্বীদের আগুনে দগ্ধ করিয়াছিল, তাহার বহু পূর্ব্বে যে বোগ্দাদ শহরে ইহুদী প্রভৃতি জাতিগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিত তাহা আমাদের শেখান হয় না। আরব জাতির মত উদার জাতি জগতে বিরল। ইউরোপে যেমন ফরাসী রীতি-নীতি আদর্শ, তেমনি এশিয়ায় পারস্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। যখনই আরব রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল তখন হইতেই পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্যসমূহ ইহার বিনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হয়। ক্রমে ইয়োরোপের দৃষ্টি এই দিকে পড়ে। বারবার ইউরোপ মুসলমান রাজ্যগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। ইহার মূলে কেবল রাজনৈতিক কারণই ছিল না—ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গোঁড়ামিই প্রবল।

এশিয়ায় চল্লিশ কোটী মুসলমানের বাস। ইহারা বাঁচিয়া না থাকিলে, মুসলমান-সভ্যতা রক্ষা না পাইলে এশিয়ার রক্ষা নাই। অস্ত্র দ্বারা বিদেশীকে বেশী দিন শাসন করা অসম্ভব—তাই সভ্যতার দ্বারা সভ্যতা জয় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন সম্রাটগণও বিজিত রাজ্যের রাজপুত্রদের রাজধানীতে কিছুদিন রাখিয়া দেশে পাঠাইয়া দিত। ইউরোপও তেমনি বিজিত দেশের সভ্যতাকে ম্লান করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এশিয়ায় মুসলমান-সভ্যতা ও হিন্দু-সভ্যতা প্রবল শক্তিসম্পন্ন। হিন্দু সভ্যতা হূণ, শক প্রভৃতি জাতির রীতি-নীতি

বেমালুম হজম করিয়াছে। মুসলমান সভ্যতা বিরুদ্ধ শক্তির সংস্পর্শে ভীষণ রূপ ধারণ করে। হিন্দু সভ্যতায় অনধিকার-চর্চ্চা রোগের বীজাণু নাই। তাই হিন্দু-মুসলীম এক থালায় না খাইয়াও বন্ধুভাবে রহিয়াছে। পাড়াগাঁয়ে হিন্দু-মুসলমান পার্থক্যবশতঃ কোনও প্রকার গোলমাল হওয়া অস্বাভাবিক। তবে অধুনা "রাজ-নীতি" এই ভেদ আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

মুসলমান সভ্যতা বিনষ্ট হইলে চল্লিশ কোটী লোক ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িবে। এশিয়া ও ইয়োরোপের সন্ধি-দ্বারে মুসলমান শক্তি লুপ্ত হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি সুদূর-পরাহত।

কিন্তু আজ মুসলমান শক্তি বিপন্ন। যদি ৩০ কোটী ভারতবাসীর মতের কোনও মূল্য থাকিত তবে এশিয়ার দুর্দ্দশা একদিনে ঘুচিয়া যাইত। সমস্ত মুসলমান যদি সংঘবদ্ধ হইতে পারিত, ভারতের সাত কোটী মুসলমানের পিছনে যদি বাহিরের ৩৩ কোটী মুসলমান দাঁড়াইতে পারিত, ভারতবর্ষের স্বরাজ মুহূর্ত্তের চেষ্টার ফলে পাওয়া যাইত। কিন্তু আজ যে যন্ত্র ভারতের বুকে অক্টোপাসের মত / ৩ / রক্তশোষণ করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে সেই যন্ত্রই ভারতের বাহিরে ইসলামের শক্তি নাশে নিযুক্ত রহিয়াছে। তাই মহাত্মা স্বরাজ ও খেলাফতে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়াছেন। যাহারা ইহাকে রাজনৈতিক চাল বলেন তাহারা হয় অন্ধ, না হয় ভারত ও ইসলামের শত্রু। / ৪ /

ষষ্ঠ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১২ই ভাদ্র ১৩২৯

মুড়ো খ্যাংড়া

শ্রীকাঁধে-বাড়ি বলরাম

এ কালপ্যাঁচাকে আর কত প্যাঁচা খ্যাঁচ্‌রা করব? বেহায়ার পেছনদিকে গাছ গজালে, বলে ছায়া হচ্ছে! বুড়ো বামুন যে এত বেহায়া বেল্লিক হয়, তা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। আর নাম করব না তার। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি গঙ্গাযাত্রীর মড়া! এখনো যদি এমন ক'রে জাতি বিদ্বেষ প্রচার কর, পাঁচটা কড়ির লোভে পাঁচ কোটি লোকের সর্ব্বনাশ কর, তবে শঙ্কর মাছের কাঁটার চাবুক দিয়ে তোমার ছাল তুলে নেব। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি। এবার তাই দেখবে। এ তোমার বৈষ্ণব-বাঘের দল নয়। এখনো তোমার মাথায়-ঢালা গুয়ের গন্ধ যায় নি, এখনো তোমার মাথার ডাণ্ডার ঘা শুকোয় নি।

'সেদিন নাকি এই বায়াত্তুরে' বুড়ো বলেছে যে, তার পিতামহ বিশালকায়

পুরুষ ছিলেন এবং বোধহয় পাঠান-রমণী না হ'লে তাঁর চলতো না! যার পিতামহ বিশালকায় পুরুষ ছিলেন, তাঁর বংশে যদি এইরকম কাপুরুষ ক্লীব জন্মে, তবে লোকে তা'কে কী বলে গাল দেয়? তিনি নানা তীর্থ-দর্শনের পুণ্যস্বরূপ বুঝি তোমা হেন রগ্‌চিলে ক্যাঁক্‌লেসেকে বংশাবতংসরূপে প্রাপ্ত হয়েছেন! তাই বিভীষণ সেজে মায়ের মুখে আমার কাদা ছিটোচ্ছ? এই নিরিমিষ্যির দেশেই এমন ক'রে দেশের শত্রুতা সাধন সম্ভব। পড়্‌তে আয়র্ল্যাণ্ডে, তা হ'লে এতদিন তোমায় কচু কাটা ক'রে ছেড়ে দিত। তোমার এই চেহারা আর প্রবৃত্তি দেখেই বোঝা যায় তোমার পিতামহের পাঠান-রমণী না হ'লে চল্‌ত না, না তাঁর নিজের ঘর সামলানোই দায় হ'ত।

এই মাজা-ভাঙা বুড়ো আবার বলেছেন, "পাঠান-রমণী পেলে আমিই কোন্ ছাড়ি?" ভ্যালারে ভ্যালা মোদ্দ! সিম-টুনটুনির আবার সাধ যায় ডুমুর গিলতে! গঙ্গাঘাটে তো এগিয়ে আছ, অথচ তরুণী ভার্য্যা, কাজেই সারারাত জেগে শুধু গরু খেদাও। তোমার "চামড়া গেছে ঝুলে, চক্ষু গেছে কোটরে, আর কোমর গেছে বেঁকে, বেড়াও লাঠি ধরে", এ বয়সে ফ্যাঁচকামাতু তোমার ফোক্‌লা দাঁতের পাটি বের ক'রে এমন ফ্যাচ ফ্যাচ করতে তোমার শরম হয় না? কিছু শৃঙ্গার তিলক ক'রে নাও আগে, গোটা কতক বম্বু খুঁটো-টুঁটো দিয়ে 'দ' মার্কা মাজাকে আগে সোজা কর, তারপর পাঠান-রমণীকে ঘরে আন্‌বে এবং আর তার দ্বারের খোজা গোলাম হবে। কুঁজোকে সাধ যায় চিৎ হয়ে শুতে!

শেষবার ব'লে রাখি, এমন ক'রে বুড়ো কালে 'ইয়ে' চুলকিয়ে আর আলকুশী নিয়ো না। মোহরর্‌মের দিন, খামখা একটা 'দুপুরে' মাতন কাণ্ড বেধে যাবে।

আমরা শুধু ইংরেজদের চুটিয়ে গাল দিতে ওস্তাদ, কিন্তু এমন দেশদ্রোহীকেও লোকে ক্ষমা করে! হিন্দু-মুসলমান মিলের অন্তরায় যদি কেউ থাকে, তবে সে এই ল্যাটেণ্ডিস বৃদ্ধ। / ১১ /

সপ্তম সংখ্যা, শনিবার, ১৬ই ভাদ্র ১৩২৯

অন্ধ ভক্ত

(সত্য ঘটনা)

জেনে শুনে ভণ্ডামী করা আর খুঁড়িয়ে বড় হতে যাওয়ার দরুণই আমাদের দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে ও যাবে।

আর সবচেয়ে নিরাশার কারণ এই যে, দেশের ডিগ্রি-ডিপ্লোমাধারীদের মধ্যেই এই ভণ্ডামী দিন দিন বেড়ে চলেছে। দেশে যতলোক তথাকথিত শিক্ষার পাঁচন গিল্‌ছে, তাদের অন্তর ততই হীন কালো হয়ে যাচ্ছে। নমুনাস্বরূপ নীচে একটি সত্য ঘটনার বিবরণ পড়ুন। এমন আরও অনেক ঘটনা জানা আছে আমাদের।

ঘটনাস্থল কলকাতার কোনো বিশিষ্ট হোষ্টেল। এই হোষ্টেলে কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের গোটা দুচ্চার অতিরিক্ত রকমের উগ্র ভক্ত আছেন। তাঁদের অতিমাত্রিক রবি-ভক্তির ঝাঁজে উত্যক্ত হয়ে ঐ হোষ্টেলেরই কয়েকটি ছেলে মিলে তাদের রবি-ভক্তির মূল্য আর সত্য যাচাই করবার জন্যে একটি রগড়-কমিটির অধিবেশন করে। তাতে নির্দ্ধারিত হয় যে, তাদের মধ্যের একজন বন্ধু যেন কোনো কলেজে পড়ে, আর সেখানের হোষ্টেল থেকে সে যেন চিঠি লিখেছে যে, সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা সে 'সবুজপত্র'-এ পড়েছে, তার মানে বুঝতে পারছে না, সেটি তার কোনো বন্ধুকে দিয়ে ব্যাখ্যা করিয়ে পাঠালে খুব ভালো হয়। অবশ্য, কবিতাটী সত্যিই রবীন্দ্রনাথের নয়, তাদেরই একজন খলিফা ঠিক রবীন্দ্রনাথের ধরণে কবিতাটী লেখে। তারপর চিঠিসমেত কবিতাটী ঐ ভক্তযুগলকে পেশ করা হয়।

কবিতা পেয়ে ভক্তযুগল মুক্তকণ্ঠ হয়ে চুটিয়ে তার ভাষ্য লেখেন। পরপৃষ্ঠায় ঐ কৃত্রিম চিঠি ও কবিতা এবং অকৃত্রিম ভাষ্য দুটি দেওয়া হ'ল।

এই না-বুঝে বুঝবার ভাণ করাটাই সব নষ্ট করছে আমাদের। কোনো মহাপুরুষ এবং তাঁর বাণীকে বুঝবার ভাণ করতে পারলে, যারা তাঁকে বোঝে না, তাদের কাছ থেকে খুব প্রশংসা আর শ্রদ্ধা আদায় করা যেতে পারে ফাঁকি দিয়ে কিন্তু এ ফাঁকি তাকেই সবচেয়ে বেশী পীড়া দেয় অন্তরে। এবং এই মিথ্যা আর ফাঁকির পীড়া তাকে দিন দিন হীন করে আনে। ফাঁকি নিয়ে যাদের কারবার তাদের মনে কোনদিন সত্যের জোর আসে না—কেন না সে যে নিজেই জানে যে সে আত্মঅবিশ্বাস, আপনাকে সে প্রবঞ্চনা করছে। এই ফাঁকি আর মিথ্যা নিয়ে কারবার করে করে দেশের অধিকাংশ তরুণই আজ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে। দেশের যুবকরাই যদি সত্যের উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে মার মার করে ছুটে না বেরিয়ে এই রকম ভীরু কাপুরুষ হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে এ চির পরাধীন মা আমার স্বাধীন হবে কোন্ দিন? আর এমন করে না-বুঝে কোন মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা করা প্রশংসা করা মানে তাঁকে অপমান করা। মিথ্যা দিয়ে দেবতাকে পূজো করলে দেবতা প্রসন্ন হন না, বরং পীড়িতই হয়ে ওঠেন। কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে আক্রমণ করছি নে, এই যে স্পিরিট, অর্থাৎ—ফাঁকি দিয়ে বড় হওয়ার লোভ—এইটাকেই আমরা ঘৃণা করি। কেননা এতে বড় হওয়ার লোভটাই বাড়ে, বড় কিন্তু হওয়া যায় না। এই ধরণের মিথ্যা পূজারীদের মিথ্যা আর ফাঁকির দরুণই আজ মহামানব মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ অনেক লোকের চোখে খাটো হয়ে পড়েছেন। / ১২ /

সপ্তম সংখ্যা, শনিবার, ১৬ই ভাদ্র ১৩২৯

আমাদের দাবী

মিসেস এম. রহমান

উচিত কথায় আহম্মক রুষ্ট; বন্ধু বিচ্ছেদের আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে, সেই ভয়ে অনেকে উচিত কথা ব'লতে ইতস্ততঃ করে; আমি বলি, বিচ্ছেদ হ'লো তো ব'য়েই গেল। উচিত কথায় যে বন্ধু রুষ্ট হয়, ঘৃণার সহিত আমি প্রত্যাখ্যান করি তার বন্ধুত্বকে। তাতে ক্ষতি হয় হোক, কিছু দুঃখ নেই, অন্তর দেবতার কাছে তো লজ্জিত হবো না সেই আমার যথেষ্ট।

উচিত ও সত্য কথার ফলে মদ্দা মেয়ে, জ্যাঠামেয়ে, জেনানার জয় ইত্যাদি নূতন নূতন কথা শুনতে পাচ্ছি। তাই ব'লে কি সত্য কথা ব'লবো না? নিশ্চয়ই ব'লবো। এই যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অত্যাচারী পর-পীড়কদের দ্বারা নির্য্যাতিত হ'য়ে আসছি, এর কারণ কি? প্রতিকার না ক'রলে অত্যাচার বাড়বে বই ক'মবে না। প্রতিকারের চেষ্টা যে কেউ করেন নি—তা নয়, তবে পচ'-মড়া-থেকো কুকুর কি স্বভাব পরিবর্ত্তন ক'রতে পারে?

যুগে যুগে কত মহাপুরুষ অবতীর্ণ হ'য়েছেন, কত সমাজ-সংস্কারক জন্মগ্রহণ ক'রছেন। প্রতিকার তাঁরা ক'রেছিলেন, কিন্তু স্থায়ী হয় নাই। যাঁদের আবির্ভাবে মুক্তি ও শান্তির মলয় মারুত প্রবাহিত হ'য়ে শরীর মন স্নিগ্ধ ক'রেছিল তাঁদের তিরোভাবে সেই মলয় সমীরই ভীষণ সাইক্লোনে পরিণত হ'য়ে সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়েছিল।

পয়গম্বরদের যুগের ইতিহাসে শুনা যায়, যখন মানুষ নাস্তিক, স্বেচ্ছাচারী হ'য়েছে, তখনই এক একজন পয়গম্বর অবতীর্ণ হ'য়ে তাহাদিগকে ন্যায়ধর্ম্ম পথে পরিচালিত করিয়াছেন।

আরববাসিগণ যখন কন্যা হত্যা করা কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত করেছিল,

তখন হজরত মোহম্মদ (দঃ) তাঁর জীবন ফাতেমা-ময় ক'রে দেখিয়েছিলেন কন্যা কিরূপ আদরণীয়া।

এইটুকু ক'রেই সন্তুষ্ট হন নি, আইন দ্বারা পুত্র কন্যা সমান ক'রে গেছেন।

কন্যা স্বামী-গৃহে যাবে ব'লে বৈষয়িক ব্যাপারে একটু কম বেশী যথা এক পুত্র পিতার যতটা সম্পত্তি পাবে, দুই কন্যায় ততটা পাবে।

ইচ্ছা করলে পিতা ত্যজ্যপুত্র ক'রতে পারবে, কিন্তু ত্যজ্যকন্যা ক'রতে পারবে না।

বিদ্যা বা জ্ঞানার্জ্জন করা নর-নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য ; এস্থলে পুত্র কন্যায় ভেদাভেদ নাই।

ইহা সত্ত্বেও তাঁর নরাধম শিষ্যেরা পুত্রকে ভবপারের কাণ্ডারী এবং কন্যাকে আবর্জ্জনাস্বরূপ মনে করে।

পুত্র যথাসর্ব্বস্বের অধিকারী—কন্যা তথা পিতৃসম্পত্তির কপর্দ্দকে বঞ্চিতা।

পুত্রকে শিক্ষা দিতে অজস্র অর্থব্যয় করা হয়, কন্যাকে শিক্ষা দিতে মনেই থাকে না। যদিই বা কোনও কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা বড় বেশী করেন তো পাখী পড়ানর মত একটু কোরআন পড়িয়ে, কর্ত্তব্য পালন করার আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। পিতা মাতা বুক ফুলিয়ে বলেন, "মেয়ে খতম-কোরআন", কিন্তু স্বয়ং "খতম-কোরআন"-এর একটা শব্দের একটা অক্ষরের মানে বোঝেন না।

পুত্র যখন উকিল, এটর্নী, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট হ'য়ে তেতলার ওপর চারতলা ওঠায়, তালুকের ওপর পরগণার মালিক হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির সঙ্গে রাজদত্ত আরও কয়েকটা অক্ষর সংযুক্ত ক'রে সুখ সম্মানের উচ্চ শিখরে আনন্দে বিচরণ করে, তখন কন্যা জ্ঞানহীনা, মূর্খ, অন্যের অনুগ্রহে প্রতিপালিতা হ'য়ে নিরানন্দ দাসীর জীবন যাপন করে।

অধিকাংশ স্থলে স্বামীপ্রেমেও বঞ্চিতা। স্বার্থপর, নিষ্ঠুর পিতা হৃদয়বান, সচ্চরিত্র লোকের পরিবর্ত্তে একটা মদ্যপ-বেশ্যাসক্ত লম্পটের বা একটা ক্রূর হৃদয়হীন শয়তানের হাতে সঁপে দিয়েছে!

একটা বাঁধি গৎ শিখে রেখেছে, "মেয়ের বিয়ের যে খরচ তাতেই সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে যাই, আবার পয়সা খরচ ক'রে শিক্ষা দিই কোথা থেকে ; বিয়ের সময় যা দিই তাতেই ওর পাওনার বেশী হ'য়ে যায়।"

হৃদয়হীন, মূর্খ! মেয়ের বিয়ের খরচ ক'রে কার উপকার করো? দাসত্বের

নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলো গয়নায় জড়-পুত্তলিকা গৃহসজ্জার উপকরণ ক'রে তোমারই মত একটা হৃদয়হীনের ড্রইংরুম সাজিয়ে দিয়েছ!

বিবাহ অর্থাৎ সংসারাশ্রম প্রতিষ্ঠা তার জন্য যে শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন, তা দিয়ে যদি মানুষের হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে, তাহলে বুঝতাম বিয়ে দিয়েছ। সারাটা জীবন তুষানলে দগ্ধ হবার জন্য হাত পা বেঁধে, অবোধ বালিকাকে অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জ্জন দিয়ে পোড়ামুখে প্রচার ক'রছ "মেয়ে বিয়েয় দশ হাজার টাকা খরচ ক'রেছি।" দূর নির্লজ্জ, হতভাগা!

একটা বিষয়ে কিন্তু হতভাগারা বড় গুরুভক্ত। কোন্ বিষয়ে জান? জীবনের উষাকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিত্যনূতন পত্নী গ্রহণ করা বিষয়ে।

তখন এমন মুচকে হেসে বলে, "সত্তর বছর বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে করা হজরতের আদেশ", একথা সত্য ব'লেই মনে হয় কারণ, তিনি তো জানতেন যে, বিশ্বস্রষ্টা উহাদিগকে কুকুরবৃত্তি দিয়ে জগতে পাঠিয়েছেন, আমরণ ও ঘৃণিত বৃত্তি ওরা ত্যাগ ক'রতে পারবে না। সুতরাং অনেক ভেবে চিন্তে উপর আদালতের রায়ই তিনি বহাল রেখে গেছেন।

উহাদের গঠিত সমাজ, উহাদের মনগড়া নিত্যনূতন ধর্ম্মগ্রন্থ আমাদিগকে তিল তিল ধ্বংস ক'রছে। যতক্ষণ না বিদ্রোহী হ'য়ে আমরা ওদের ভুল বুঝিয়ে দেবো, ততক্ষণ ওরা নিজেদের দুষ্কর্ম্মের মাত্রা অনুভব ক'রতে পারবে না।

জ্ঞান হেন অমূল্য রত্নে বঞ্চিত ক'রে ওরা আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রছে।

প্রায়ই ওরা আমাদিগকে দূর হ'য়ে যেতে বলে। বারম্বার উহা শুনেও কেন আমরা দূর হ'য়ে যাই নি, সে কথাও কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করে।

সাহিত্যচূড়ামণি স্নেহাস্পদ ভ্রাতা ডাক্তার লুতফর রহমান সাহেব বড় চমৎকার ভাষায় ব'লেছেন, "পুরুষের যেন নারীকে দূর বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার কিছু না থাকে, তার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। পুরুষ যদি সত্যিই নারীকে দূর করিয়া দেয়, তবে যেন তাহাকে চোখে সব অন্ধকার দেখিতে না হয়। নারী দূর হইয়া যাইতে পারে না বলিয়াই কত ব্যথা, কত অসত্য সে সহিয়া থাকে!"

কি চমৎকার সত্য কথা! মরণ আছে ব'লেই জীবনের আদর, নতুবা জীবনের মূল্যই থাকতো না। ওরা ভালরূপে জানে যে, দূর হয়ে যেতে আমরা পারবো না। সেই জন্যেই জোর গলায় দূর হয়ে যেতে বলে। যদি আমরা দূর হয়ে যেতে পারতাম, যাবার জায়গা থাকতো তাহ'লে কখনই ওরা মুখেই আনতো না ও কথা।

সেই মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত বিনা রক্তপাতে ভাইকে যারা সূচ্যগ্রভূমি ছেড়ে দেয় না, তারা আমাদিগকে দেবে প্রাপ্য অধিকার!

—"তীক্ষ্ণ সূচী মুখাগ্রেতে ধরে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি।"

ভগিনীগণ! "কোহিনূরের মূল্য পাঁচ জুতি"। পাঁচজুতি মেরে কেড়ে নিই এস আমাদের প্রাপ্য অধিকার।

আর আমাদেরও সম্পূর্ণ ভুল। অধিকার চাইছি কার কাছে, না পুরুষদের কাছে। যাদের নিজেরই কোনও বিষয়ে অধিকার নেই, কাঙ্গালের প্রবৃত্তি নিয়ে যারা বড় হ'তে চাইছে, গোলামীর নাগপাশে শত রকমে আপনাদিগকে বেঁধে জীবনের আদর্শকে যারা ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর ক'রে ফেলেছে, আত্মা পর্য্যন্ত যাদের গোলাম হ'য়ে গিয়েছে, তারাই দেবে আমাদিগকে অধিকার? মুক্তিদান ক'রবে তারা আমাদিগকে? পাগল না কি! গোড়া দেশের দণ্ডাজনেরা দেবে আমাদিগকে সম্মান?

প্রকাশ্য রাজসভায় যারা পূজনীয়া নারীকে উলঙ্গিনী ক'রেছিল, কারবালার মহাপ্রান্তরে জগতপূজ্যা, শোকাতুরা মহিলাগণকে যারা মস্তকাবরণহীনা (ওড়নাহীনা) ক'রেছিল, মাতৃজাতিকে যারা রক্তলোলুপা বাঘিনী ব'লতে কুণ্ঠিত হয় নাই, (বর্ত্তমান সময়ে নারীর অপমান কহতব্য নয়) তারাই দেবে তোমাদিগকে সম্মান! মানুষের শ্রদ্ধা যে পায় না, সে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিতে থাকে। তাই আজ যুগে যুগের পুঞ্জীভূত অপমান শুধু বাঘিনী নয়, ফণিনীও ক'রেছে আমাদিগকে। রক্তলোলুপা বাঘিনীরূপে অপমানকারিদের হৃদয়ের রক্ত পান ক'রে শরম বেদনার উপশম ক'রবো; দলিতা ফণিনীরূপে ঝলকে ঝলকে বিষোদ্গার ক'রে দংশনে দংশনে তাদিগকে জর্জ্জরিত ক'রে তীব্র অপমানের জ্বালা ভুলবো /৮/

দশম সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২রা আশ্বিন ১৩২৯

'ধূমকেতু-পরিচয়'

স্বল্পজীবী 'ধূমকেতু' পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। স্মরণীয়তালাভের প্রধান কারণ পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ-কালে নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ছিলেন তার 'সারথি'—নজরুল ইসলামের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গদ্য ও পদ্যরচনা 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত

হয়। বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে সাজাত্যবোধ ও স্বদেশচেতনা প্রসারেও পত্রিকাটির বিশেষ ভূমিকা ছিল। এবং যদিও নজরুল ইসলাম নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান ('ধূমকেতু'র অধিকাংশ রচনা তাঁরই লেখা)। কিন্তু 'ধূমকেতু'কে কেন্দ্র করে আরও কয়েকজন তরুণ লেখক আত্মপ্রকাশ করেন—যাঁদের অধিকাংশ লেখাই আজ বিলুপ্ত। নজরুল ইসলামের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার পাশে তাঁর সহযোগীরা কিছুটা ম্লান হয়ে গেছেন সন্দেহ নেই—কিন্তু প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে মনে হয়, 'ধূমকেতু' পত্রিকার অধুনা দুষ্প্রাপ্যতাই অন্যান্য লেখকদের বিস্মৃতির পথে নিয়ে গেছে। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুল ইসলামের অধিকাংশ কবিতা তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলিতে সংকলিত হয়েছে, এবং তাঁর অনেকগুলি গদ্য-রচনাও 'দুর্দিনের যাত্রী' (১৯২৬), 'রুদ্রমঙ্গল', (প্রকাশ তারিখ নেই) ও সম্প্রতি প্রকাশিত 'ধূমকেতু' (১৯৬০) গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য লেখকদের রচনা পুনর্মুদ্রণের সুযোগ পায় নি।

কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় শুক্রবার ১১ই অগাস্ট ১৯২২ (২৬ শ্রাবণ ১৩২৯)। পত্রিকাটি অর্ধ-সাপ্তাহিক ('সপ্তাহে দু'বার ক'রে বেরুবে')। "ধূমকেতুর নিয়মাবলী"তে বলা হয়েছে, 'ধূমকেতু প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার ও মঙ্গলবার বাহির হইবে। [তবে কখনো কখনো বিশেষ উপলক্ষে বা ছুটির জন্য অন্য দিনেও পত্রিকা বেরিয়েছে]। বার্ষিক: ডাকমাশুল সমেত ৫৲ পাঁচটাকা; যাণ্মাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা; তিনমাসের জন্য ১৷৷০ দেড় টাকা। তিন মাসের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা। [বিশেষ সংখ্যা, যেমন 'মোহর্‌রম্ সংখ্যা'র দাম দু' আনা]। ভিঃ পিঃ তে ধূমকেতু পাঠান হয় না। প্রবন্ধ, টাকাকড়ি, সমালোচনার্থ পুস্তক-পুস্তিকা, বিনিময়ের কাগজাদি ৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা ঠিকানায় ধূমকেতুর সারথির নামে পাঠাইতে হইবে।" প্রথম কয়েক সংখ্যা 'ধূমকেতু-কেন্দ্র' ছিল ৩নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যায় (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২২) জানানো হয়েছে, "'ধূমকেতু'র কেন্দ্রচ্যুতি / 'ধূমকেতু' কেন্দ্র ৭নং প্রতাপ চাটুয্যের লেন-এ উঠে এসেছে। অতঃপর চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিনিময়ের কাগজ সবই এ ঠিকানায় 'ধূমকেতু'র একমাত্র স্বত্বাধিকারী কাজী নজরুল ইস্‌লামের নামে পাঠাতে হবে।" 'ধূমকেতু'র 'কর্মসচিব' ছিলেন শ্রীশান্তিপদ সিংহ [পত্রিকায় 'কর্মসচিব'-এর উল্লেখ থাকলেও নাম নেই। 'অগ্নিবীণা'র 'প্রকাশক' হিসাবে শ্রীশান্তিপদ সিংহের নাম বিজ্ঞাপনে

পাওয়া যায়]। 'ধূমকেতু' পত্রিকা "মোহম্মদ আফজাল্-উল হক্ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মেটকাফ প্রেস—৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট; কলিকাতা।" 'ধূমকেতু'র নবম সংখ্যা পর্যন্ত পত্রিকার শিরোনামের নিচে "সম্পাদক—কাজী নজরুল ইস্‌লাম" ছাপা হতো। দশম সংখ্যা থেকে ছাপা হলো "সারথি—কাজী নজরুল ইস্‌লাম", এবং "Printed, Published & *Edited* by Afzlul Wool Huque" (ইট্যালিক্স আমার দেওয়া)। যদিও আফজাল-উল-হক্ কোনোদিনই পত্রিকার সম্পাদনা করেন নি, তবু মনে হয় 'বিশেষ কারণে এ বন্দোবস্ত করা হ'ল।' (দ্র. 'অগ্নিবীণা'র বিজ্ঞাপন)। প্রথম বর্ষে 'ধূমকেতু'র প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছিলেন শিল্পী চারু রায় (১৮৯০-১৯৭১)।

'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে একুশ সংখ্যা (১৪ নভেম্বর ১৯২২, ২৮ কার্তিক ১৩২৯) পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন নজরুল ইসলাম। [একুশ ও বাইশ সংখ্যা আমি দেখি নি]। বাইশ সংখ্যা থেকে (১ অগ্রহায়ণ ১৩২৯) থেকে অমরেশ কাঞ্জিলাল পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। নজরুল ইসলাম এই সময়ে রাজরোষে কারারুদ্ধ হন। 'ধূমকেতু'র দ্বিতীয় পর্ব (নব পর্যায়) সম্পাদনা করেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক—দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় 'ধূমকেতুর আদি উদয়-স্মৃতি' শিরোনামায় নজরুল লেখেন, "১৩২৯ সাল, শ্রাবণ মাস—'তিমির ভালে অলক্ষণের তিলক রেখা'র মতই 'ধূমকেতু'র প্রথম উদয় হয়। তখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সক্রিয় ধুলোট উৎসব পুরামাত্রায় জমিয়া উঠিয়াছে। কারাগারে লোক আর ধরে না, ধরা দিতে গিয়ে পুলিশে ধরে না—'বন্দেমাতরম্', 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' রব আকাশে বাতাসে আর ধরে না। মার খাইয়া খাইয়া পিঠ শিলা হইয়া গিয়াছে, মারিয়া মারিয়া পুলিশের হাতে খিল ধরিয়া গিয়াছে। মার খাইবার সে কি অদম্য উৎসাহ।...ইহারই মাঝে স-প্রমথ প্রলয়েশ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। দেশের নেতা, অপ-নেতা, হবু-নেতা সকলে যখন বড় বড় দুরবীন লাগাইয়া স্বরাজের উদয়তারা খুঁজিতেছিলেন তখন আমার উপরে শিবঠাকুরের আদেশ হইল এই আনন্দরজনীকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিতে। আমার হাতে তিনি তুলিয়া দিলেন—'ধূমকেতু'র ভয়াল নিশান। স্বরাজ প্রত্যাশীদল নিন্দা করিলেন, গালি দিলেন। বহু ধূলি উৎক্ষিপ্ত হইল, বহু লোষ্ট্র নিক্ষেপিত হইল। 'ধূমকেতু'কে তাহা স্পর্শ করিতে পারিল না।... 'ধূমকেতু' কল্যাণ আনিয়াছিল কি না জানি না, সে অকল্যাণের প্রতীক হইয়াই আসিয়াছিল। 'ধূমকেতু' তাহাদেরি বাণী লইয়া আসিয়াছিল—যাহাদের গৃহী

আশ্রয় দিতে ভয় পায়, গহন বনে ব্যাঘ্র যাহাদের পথ দেখায়, ফণী তাহার মাথার মণি জ্বালাইয়া যাহাদের পথের দিশারী হয়, পিতামাতার স্নেহ যাহাদের দেখিয়া ভয়ে তুহীন শীতল হইয়া যায়। রুদ্রদেব আশীর্ব্বাদ করিলেন, আমার কারা শুদ্ধি হইয়া গেল। প্রয়োজনের আহ্বানে, নট-নাথের আদেশে আমি নিশান-বর্দ্দার হইয়াছিলাম, তাহারি আদেশে 'ধূমকেতু' অন্ধ বিমান পথে হারাইয়া গিয়াছে।" ('ধূমকেতু,' কলিকাতা, এ. ফয়েজ, ১৩৬৭, পৃ. ১-২)।

'ধূমকেতু' শুধু তরুণের বিদ্রোহ নয়, তরুণের আদর্শবাদের প্রকাশও বটে। হয়তো ব্যবসায়িক সাফল্য 'ধূমকেতু'র কপালে ছিল না (দ্র. শান্তিপদ সিংহ, "নজরুল কথা", কলিকাতা, নবজাতক প্রকাশন, ১৩৭৯), কারণ 'কমার্শিয়াল'-বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান 'ধূমকেতু' প্রচারের পিছনে, কাজ করে নি, তবু, অথবা সেইজন্যই, পত্রিকা একটা নিজস্ব 'চরিত্র' অর্জন ও রক্ষা করেছিল। 'ধূমকেতু'র "বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী" উদ্ধৃত করলেই পত্রিকার স্বতন্ত্র লক্ষ্য ও অভীষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে— "১। দেশের অনিষ্টকর কোন বিলাতী বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না ২। মদের বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৩। কোনরূপ অশ্লীল বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৪। দেশীয় বিজ্ঞাপনের মধ্যে যদি এমন কোন ঔষধ বা জিনিস থাকে যাহাতে দেশের লোকের আর্থিক বা নৈতিক ক্ষতি হইতে পারে, সেরূপ কোন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৫। হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষমূলক কোন বিষয়ের বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না বা কোন আলোচনা করা হয় না। ৬। মফঃস্বলবাসী ক্রেতাগণ বিজ্ঞাপনদাতাগণের নিকট প্রতারিত হইয়া আমাদিগকে জানাইলে আমরা তৎক্ষণাৎ সেই বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দিব এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিব। ৭। অনাথা বিধবা ও দেশের জন্য যাহারা জেল খাটিয়া আসিয়া সামান্য মূলধনে কারবার করিতেছেন, প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করা হয়। ৮। ভারতবর্ষীয় শ্রম, অর্থ ও শিল্পজাত দ্রব্যের বহুল প্রচার উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত দ্রব্যের নিরপেক্ষভাবে দোষগুণ সমালোচনা করা হয়।"

'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রথম প্রকাশকালেই কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—শুধু সাংবাদিক বা সাহিত্যিক কারণে নয়, নজরুল ইসলামের পত্রিকা বলেই। পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পাশে নজরুলের উদ্দেশ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ কবিতা প্রকাশিত হলো—'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু, / আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,...' ; পরে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা ব্লক

করে [সপ্তম সংখ্যা, ১৬ ভাদ্র ১৩২৯ থেকে] তৃতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পাশে বা উপরে ছাপা হতে থাকে। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় নজরুল ইসলাম ছাড়া অন্য যাঁদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—মোজাম্মেল হক্, সুবোধচন্দ্র রায়, বলাই দেবশর্ম্মা, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মহামায়া দেবী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, উদ্‌ভ্রান্তচৈতন্য গোস্বামী [ছদ্মনাম], হুমায়ুন জহীরুদ্দীন আমির-ই-কবীর, ভবানীপ্রসাদ রায়, মিসেস এম. রহমান, মিসেস আর. এস. হোসেন, মিসেস ডি এম. রহমান, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যতীন্দ্র ভট্টাচার্য, অমিয়বালা বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলবালা ঘোষজায়া, বিন্দুবাসিনী রায়। সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও সম্পাদকের কবিতা ছাড়া 'ধূমকেতু'তে কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ ছিল, যেমন—'ত্রিশূল' [এই বিভাগে নিয়মিত লিখতেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ; বিষয়—"ম্যাট্‌সিনির মর্ম্মবাণী", "আমার আত্মকথা (টলষ্টয়)" প্রভৃতি]; 'সন্ধ্যা-প্রদীপ' [এটিকে নারী-জগৎ বলা যেতে পারে, প্রধানত মহিলাদের লেখা এই বিভাগে প্রকাশিত হতো। তবে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুরুষের মুখে মেয়েদের কথা' রচনাটিও 'সন্ধ্যাপ্রদীপ' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে]; 'মুসলিম-জাহান' [মুসলিম সমাজের সংবাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশিত হতো। লেখকের নাম না থাকলেও জানা গেছে, এই বিভাগটি পরিচালনা করতেন মইহুদ্দীন হোসায়েন]; 'দেশের খবর' এবং 'পরদেশী পঞ্জী' [সংবাদ কণিকা ; কৌতুকের ভঙ্গিতে দেশী ও বিদেশী সংবাদ পরিবেশন এবং অম্লমধুর সম্পাদকীয় মন্তব্য]; 'নিক্তি-নিকষ' [পুস্তক-সমালোচনা ; সম্ভবত সম্পাদক নিজেই পুস্তক সমালোচনা করতেন, অন্তত ভাষারীতি ও মন্তব্যের বিশিষ্টতা থেকে তাই মনে হয়]; 'শানাই'-এর পোঁ [অন্য পত্রিকা থেকে নির্বাচিত রচনার পুনর্মুদ্রণ।]

'ধূমকেতু' পত্রিকা একদা কলকাতায় সাড়া জাগালেও (পত্রিকায় লেখা থাকতো "Guaranted largest circulation in Calcutta / কলকাতায় সব কাগজের চেয়ে বেশী কাট্‌তি"), এখন পত্রিকাটির কপি প্রায় অন্ধকারণীয়-ভাবে বিনষ্ট—বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি সংখ্যা কারো কারো কাছে আছে, কিন্তু সবগুলি সংখ্যা আর দেখতে পাওয়ার উপায় নেই। যে কয়েকটি সংখ্যা দেখবার সুযোগ পাওয়া গেছে, তা থেকে এই সংকলন করা হয়েছে। স্থানাভাবের জন্য সব লেখা পুনর্মুদ্রণ করা গেল না—তবে নির্বাচিত যে লেখাগুলি এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো তা থেকেই 'ধূমকেতু'র একটা সমগ্র পরিচয় পাওয়া যাবে। কোনো

কবিতা গ্রহণ করিনি, কারণ নজরুল ইসলামের লেখা কবিতা তাঁর কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যাবে, অন্য কবিদের রচনা কাব্য হিসাবে মূল্যবান মনে হয় নি। গদ্য প্রবন্ধও যে সব মূল্যবান রচনা তা নয়, কিন্তু এগুলির মধ্যে সাময়িক উত্তেজনার সঙ্গে কিছু ইতিহাসের সামগ্রী পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক—তিন ধরনের রচনাই 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশ রচনায় ব্যঙ্গবিদ্রূপের সুর ফুটেছে—এবং 'ধূমকেতু'র শ্লেষাঘাতকে সব সময়ে 'অহিংস'ও বলা যায় না। রাজনৈতিক সুবিধাবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে 'ধূমকেতু' বিষোদ্গীরণ করেছে ; হিন্দু মুসলমান মৈত্রী ও ঐক্যবিরোধীদের 'ধূমকেতু' কখনো ক্ষমা করে নি ; নারী স্বাধীনতার জন্য 'ধূমকেতু' প্রাণ দিয়ে লড়েছে, অন্ধ ও মূঢ় স্তাবকতা এবং বীরপূজার বিরুদ্ধে 'ধূমকেতু' সদা-সোচ্চার। বলাবাহুল্য, আজকের দিনের 'ধূমকেতু'র অধিকাংশ লেখার রচনাভঙ্গি কিছুটা দুর্বল ও শিথিল বলে মনে হবে—গদ্যের ভাষা বড়োবেশি আবেগাত্মক, অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তি প্রবণ, অলংকার ও রূপকবহুল। প্রতিপক্ষকে আক্রমণের সময়ে ক্ষমাহীন কঠোর মনোভাব—যা শুধু মিসেস এম, রহমান-এর 'আমাদের দাবী' অর্থাৎ নারীর দাবী ঘোষণার মধ্যে প্রকাশ পায় নি, যেখানে পুরুষজাতি সম্বন্ধে অনেক 'কঠোর সত্য' জোর করে কানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে,—কখনো এই আক্রমণ একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেমে এসেছে, যার নিদর্শন শ্রীকাঁধে-বাড়ি-বলরাম-এর 'মুড়ো খ্যাঁংড়া'। শ্রীশান্তিপদ সিংহ জানিয়েছেন, নজরুল ইসলাম স্বয়ং 'শ্রীকাঁধে-বাড়ি বলরাম' ছদ্মনামে এই রচনাটি লেখেন ; এবং মুড়ো খ্যাঁংড়ার উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি হলেন বিখ্যাত সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৩)। বলাবাহুল্য, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে 'স্বরাজ' বা 'নায়ক' পত্রিকায় প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে যে-ভাষা ব্যবহার করতেন তা আদৌ শিষ্ট বা মার্জিত ছিল না, তবু মনে হয় 'ধূমকেতু' যেন কিছুটা পাল্লা দিয়ে অশালীন ও অমার্জিত ভঙ্গিতে পালটা আক্রমণ চালিয়েছে। 'ধূমকেতু'র একদা-জনপ্রিয়তার পিছনে সম্ভবত এই আবেগময় অহংসর্বস্ব বিশেষ ও নির্বিশেষ রচনারীতি কাজ করেছিল। আজকের দিনে 'ধূমকেতু'র পাতা উল্টোলে স্পষ্টই বুঝতে পারি, আমরা পাঁচকড়ি নজরুলের কাল থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। তবু অর্ধশতাব্দী পূর্বে আমাদের সমাজ ও সাহিত্য, সংবাদপত্র ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক কেমন ছিল জানতে হলে 'ধূমকেতু' আমাদের সাহায্য করবে। আবার অনেকেরই হয়তো মনে হয়, মৌলিক পরিবর্তন তেমন একটা কিছু ঘটেনি—ইতিহাসের পুনরাবর্তন অপ্রত্যাশিত হলেও অসম্ভব নয়।

অলোক রায়

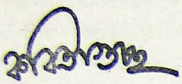

কবিতাগুচ্ছ

যোগব্রত চক্রবর্তীর কবিতা

তারাপদ রায়

মনে হয় অনেককাল আগের স্মৃতি যেন, অথচ মাত্র বার চৌদ্দ বছর আগেকার কথা। তখনো আমরা কালীঘাটের পুরনো বাড়ি ছেড়ে চলে আসিনি। চার পাঁচটি আমার চেয়ে অনেক কম বয়সের সদ্যযুবক সময়ে অসময়ে সেই ভাঙা বাড়িতে এসে হৈচৈ করতো, তাদের মূল উৎসাহ ছিল সাহিত্যে, যদিও বহু উল্টোপাল্টা বিষয়েই তাদের উত্তেজনা ছিল প্রায় আমার মতই অপরিসীম। এ ছাড়া বাজে এবং নিরর্থক গল্প এবং হাসিতে তারা মধ্যে মধ্যেই আমাকে পরাজিত করে চলে যেতো, চা না দিলে মিনতিকে বলতো অবিলম্বে পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন করতে। যোগব্রত চক্রবর্তী শংকর দাশগুপ্তকে বলতো, 'এই শংকর, এই ভদ্রমহিলাকে ট্যাক্সি করে মানিকতলায় রেখে এসো।' প্রলয় শূর নামধারী যুবকটি কখনো ক্ষীণ প্রতিবাদ করতো, কলরোলে ভরে উঠতো আমাদের অস্থিসার, চর্মহীন বাড়ির সদ্যসংসার।

একটা ছোট পত্রিকা ছিল ওদের, অন্বীক্ষণ সম্ভবত নাম ছিল সেই কাগজটির, যার মূল দায়িত্ব ছিল সৌমেন নামে এদেরই এক বন্ধুর। এখন কালেভদ্রে প্রলয় কিংবা শংকরের সঙ্গে দেখা হয়, সৌমেনকে একেবারেই দেখি না, আরো কয়েকজন সঙ্গী ছিল এদের তাদের-ও দেখি না, শুধু যোগব্রত, যোগব্রতই এতকাল কাছে কাছে ছিল।

হঠাৎ একেক দিন রবিবারের সকালে, কোন কোন সন্ধ্যায় যোগব্রত এসে উপস্থিত হতো, দূর থেকে ডাকতে ডাকতে আসতো, 'তারাপদদা, তারাপদদা।'

যোগব্রত আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট, আমাকে দাদা বলাই স্বাভাবিক কিন্তু গ্রাম সম্পর্কে যোগব্রত আমার কাকাস্থানীয়। কি এক বারেন্দ্রীয় ডালপালায় কাণ্ডপল্লবের সূত্রে যোগব্রতর বাবাকে আমার মা ডাকতেন উপেন মামা।

সে সব অনেকদিন আগেকার কথা। বহুদূরে ধলেশ্বরী নামে এক নদী ছিল, ছিল এক ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম, চমৎকার মজার অনার্য নাম ছিল সেই গ্রামের, এলাসিন। ঢাকা আর সিরাজগঞ্জের স্টিমার এসে সকাল সন্ধ্যায় ভেঁপু বাজাতো সেই গ্রামের ঘাটে, সেই গ্রামের আকাশে যে নীলিমা ছিল, বাতাসে যে মধুরতা ছিল, ক্ষেতের ফসলে যে স্বাদ-গন্ধ ছিল তা আজও ভোলা গেল না। আমাদের বাড়ি আর আমাদের মামার বাড়ি দুই-ই এই গ্রামে আর এই দুই বাড়ির ঠিক কোনাকুনি যোগব্রতদের বাড়ি। যোগব্রতর বড় ভাইরা সবাই আমার আজন্ম পরিচিত, তার মধ্যে একজন, ভক্তিব্রত ডাক নাম ছোটো আমার ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু। শুধু কনিষ্ঠতম যোগব্রতকেই চিনতাম না, তার কারণ যে বড় হওয়ার আগেই আমরা দেশভাগের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।

যোগব্রতের সঙ্গে পরিচিত হলাম ঐ কালীঘাটের বাড়িতে, তখন যোগব্রত সদ্য যুবক, দু'একটি কবিতা লেখা শুরু করেছে। এরপর অনেকদিন চলে গেছে, কখনো খুব কাছে, কখনো সামান্য কিছু দূরে এই দীর্ঘকাল যোগব্রত আমাদের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে।

যোগব্রতর জন্ম ১৯৪৩ সনে, বাংলা ১৩৫০, মন্বন্তরের বছর। তারপর ১৯৪৬ দাঙ্গার বছর। তারোপরে সেই সাংঘাতিক ১৯৪৭, দেশবিভাগ কয়েকটি মানুষকে রাতারাতি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করলো, যারা দুই বাংলার কোন প্রান্তেই গ্রহণযোগ্য নয়। যোগব্রতর সেই শৈশব বা কৈশোরের বিশেষ কোন সংবাদ আমি জানি না। যোগব্রতর সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হলো, তার পরিচয় জানলাম, তখন তার গায়ে ধলেশ্বরী নদী বা এলাসিন গ্রামের কোন ছাপ লেগে নেই, থাকার কথাও নয়, কিন্তু একটা আকুলতা ছিল জন্মভূমির জন্যে, কখনো কখনো তার কবিতায়-ও সেটা প্রতিফলিত হয়েছে।

যোগব্রতরা পাঁচ ভাই, তার মধ্যে যোগব্রত সর্বকনিষ্ঠ। যোগব্রতর বাবা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী খুব শৌখীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর প্রধান শখ ছিল ফুলগাছ। আমার কৈশোর স্মৃতিতে আজও সমুজ্জ্বল হয়ে আছে যোগব্রতদের দেশের বাড়ির ছবি। করোগেট টিনের বাংলো ধাঁচের ঘর, সামনের বাগানে সেই পাড়াগাঁয়ের পক্ষে দুর্লভ, আশ্চর্য সব ফুলের গাছ।

স্কুলের বয়সে পৌঁছবার আগেই যোগব্রত কলকাতায় চলে আসে। তার স্কুলের পড়াশুনো এখানেই দক্ষিণ কলকাতায়। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর যোগব্রত আশুতোষ কলেজে ভর্তি হয়। যোগব্রত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।

জীবিকার জন্যে কিছু কিছু গদ্য রচনা, কখনো কখনো কলকাতা বেতারকেন্দ্রে ঘোষকের কাজ যোগব্রত করেছে। কলকাতা বেতারকেন্দ্রের যুববাণী শাখাটি যখন আরম্ভ হয়, সেই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মূল চরিত্র ছিল যোগব্রত। তারপর একসময় সে বেতারকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অবশ্য শেষের দিকে আবার কিছু কিছু খুচরো কাজ করছিল, তবে আশা ছিল নিকট ভবিষ্যতে হয়তো বেতার কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে যোগব্রত নিযুক্ত হবে। ইতিমধ্যে অবশ্য যোগব্রত একটি ছোটখাটো ব্যবসাও গড়ে তুলেছিল, ব্যবসাটি ছিল বৈদ্যুতিক পাখার। আমাদের অনেকেরই বাড়িতে যোগব্রতর কাছ থেকে নেয়া খুব সস্তা দামে সুন্দর পাখা এখনো চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে।

যোগব্রত মধ্যে মধ্যে বিয়ের কথা বলতো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর বিয়ে করেনি, অবশ্য বিয়ে করার বয়েস তার এখনো যথেষ্ট ছিল।

বহু কবিতা লিখেছে যোগব্রত, সমস্ত বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় তার কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। তার গদ্য রচনার সংখ্যাও কম নয়। গত বছর পূজোর সময় তার একটি উপন্যাসও প্রকাশিত হয়েছিল। এক অকালমৃত, তরুণ লেখকের এই সাহিত্য রচনাগুলির মূল্য এই মুহূর্তে নির্ণয় করা কঠিন কিন্তু তার গদ্যরচনায় ছিল এক জাতের প্রশান্ত সরলতা এবং তার কবিতায় ক্ষীণ ব্যঙ্গের সঙ্গে মহৎ আক্ষেপ সংযোজিত হয়েছিল, ভবিষ্যতে যা হয়তো তাকে সুনির্দিষ্ট এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করতো। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তার কবিতাগুলিতে সবাই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছে কি নির্লিপ্ত এবং উদাসীনভাবে, হয়তো নিজের অজান্তেই, সে মৃত্যুর ছায়া বারবার কবিতায় টেনে এনেছে।

কিন্তু এসব কিছুর ঊর্ধ্বে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে অন্তত একটি কারণে যোগব্রত স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রায় এক দশক ধরে হাজার হাজার কবিতা পাঠকের হাতে প্রতিটি পঁচিশে বৈশাখের সকালে রবীন্দ্রসদনে আর জোড়াসাঁকোয় যোগব্রত তুলে দিয়েছে 'পঁচিশে বৈশাখের কবিতা।' খ্যাত-অখ্যাত সমস্ত স্তর ও দলের কবির লেখা যোগব্রত কষ্ট করে সংগ্রহ করে, যত্ন করে ছাপতো।

যোগব্রতর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশেনি এমন কোন বাঙালী সাহিত্যিকের কথা ভাবা কঠিন। শুধু সাহিত্যিক নয়, কত ধরনের কত রকম লোকের সঙ্গে যে

তার ঘনিষ্ঠতা ছিল তা দেখে আমরাই একেক সময় অবাক হয়ে গেছি। তার মৃত্যুর দিন সকালে রিক্সাওয়ালা, মজুর, ভদ্রলোক, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমবেত হয়েছিল তার মৃতদেহের পাশে। সকলের কাছে এই ভালবাসা খুব সহজে পাওয়া যায় না।

গত পহেলা এপ্রিল গভীর রাতে, প্রায় শেষ রাতের দিকে যখন যোগব্রত বাড়ি ফিরছিল সেই সময় রহস্যময়ভাবে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ এখনো স্পষ্ট নয়, তার দেহে যেমন কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি তেমনি কোন ভাবে আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে এটাও মেলানো কঠিন। অন্যদিকে যোগব্রতর বিষয়ে আত্মহত্যা অকল্পনীয়। দোসরা এপ্রিল সকালে যোগব্রতর বাড়ির পথের পাশে বেহালার চণ্ডীতলায় একটি পুকুরে জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে জালে যোগব্রতর মৃতদেহ পায়। আমরা মর্গের ভিতরে এবং শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে উঠবার আগে মৃত যোগব্রতের মুখ দেখেছি, কোন ভয়-দুঃখ, হতাশা বা বেদনা, এই মরপৃথিবীর কোন মলিন স্পর্শ সে মুখে লেগে নেই, প্রাণোচ্ছল চির-কিশোর যোগব্রত অত্যন্ত সহজভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কিংবা যায় নি আজও, রয়ে গেছে, কোনদিন সময়-অসময়ে খোলাদরজা দিয়ে আমাদের পণ্ডিতিয়ার একতলায় ঢুকে পড়বে, বলবে, 'তারাপদদা আপনার কিচ্ছু হবে না, এ সব কি যাতা লিখেছেন।'

জানি এ রকম হবে না, এ রকম হয় না, সম্ভব নয়, যোগব্রত আর কোনদিন ফিরবে না, কোনদিন কোন হট্টগোলে, কোন নিমন্ত্রণ সভায়, পথে-ঘাটে, সুখে-দুঃখে যোগব্রতের সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না, হৈহৈ করে ছুটে আসবে না যোগব্রত, আমার গল্প শুনে সে আর কোনদিন হেসে উঠবে না, তার গল্প আমি শুনতেই পাবো না।

গত ২৫ বৈশাখ 'প্রিয় যোগব্রত' নামে একটি মর্মস্পর্শী এপিটাফ প্রকাশিত হয়েছে, এপিটাফটি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের রচনা, তার মধ্যে এই চার লাইন আমি এখানে ব্যবহার করছি যোগব্রত সম্পর্কে আমাদের মনের শেষ কথা বোঝাতে :

'হয়তো সুখীই হয়ে হয়তো শোকার্ত হয়ে একা মধ্যযাম বেছে নিয়ে চলে গেছে। আমরা দুঃখিত নই। আমরা প্রত্যেকে জানতাম কূট পৃথিবীতে তার সরল যৌবন মানাচ্ছে না। তার প্রেমের অক্ষর লেখার যথার্থ কাল আরো বহুদিন পর, শতাব্দীর পর.....।'

যোগব্রত চক্রবর্তীর ছয়টি কবিতা

অসমাপ্ত কবিতা

যে মানুষ গভীর সম্পর্কহীন হৃদয়ের কাছে
একা থাকে
কিছু অভিমানে
আমি তার কাছে ভিক্ষা চাই।
কোথায় ধারাপতনের শব্দ একাকার কলকাতা
অলৌকিক বৃষ্টিপাতে
সে কোন অসুখে দূরে থাকে।
দূরে ও অদূরে কাছে দূরে সনাতন বিষণ্ণতা
আমাকে আচ্ছন্ন করে।
আমি কার কাছে গিয়েছি সর্বদা
ভুবনডাঙার মাঠে যে কিশোর
গভীর আক্রোশে ছেঁড়ে পূর্বপুরুষের নামাবলী
তার শোক কে বুঝেছে ?
কে বুঝেছ তার অভিমান ?

নিজের কাছে

আমার প্রকৃত কোন মূল নেই
কোন প্রথা নেই তাই ছিন্নমূল
মানুষের ভালবাসা অনায়াসে ভুলে যাই
প্রথামত নত হই তোমাদের কাছে।

আমাকে একাকী ছাড়ো
যেতে দাও যেদিকে যাবার
তোমরা সবংশে থাকো
থুতু চাটো, খাও এঁটো পাতা
আমার ওসবে কোন লোভ নেই।

শরীর তছনছ কার রক্তপাত কার
নিজের আত্মাকে জানি
সে আমাকে কোনদিন ভুল বোঝাবে না।

অন্তরঙ্গ

যদি বলো তুমি যাবে
তোমার ঠিকানা রেখে দেবো মনে মনে
কোন বসন্তে রক্তপলাশ—দেখো
আমার লেফাফা তোমাকে পৌঁছে দেবে।

যদি মনে ভাবো এসব বানানো কথা
ঠিক ভেবে নিও বিদায় নেবার আগে
তবে দেবো কিছু স্মৃতির উষ্ণ পাতা
যা কিছু আমার এতদিন ছিল কাছে।

প্রথাগত ছিল তাহাদের আনাগোনা
স্থির বিশ্বাসে আমিও ছিলাম একা
হঠাৎ দুয়ারে উদাসীন কার ছায়া
দেখো উৎসবে মুখরিত বনভূমি।

তুমি কি কখনো আকাশ দেখেছো একা
শুনেছো গভীরে নূপুরের রিণরিণ
তুমি কি কখনো উদাসী হাওয়ার সাথে
খেলা করেছিলে মাঝরাতে একাকিনী !

এখন শব্দের কাছে

এখন শব্দের কাছে একমাত্র পৃথিবীই ঋণী
মাঝরাতে ভুল হয় মানুষের সম্পর্ক বিচারে
ব্রেসিয়ার মুক্ত স্তন আশ্রয় সন্ধান খোঁজে
বিছানার বাঁ পাশ ডান পাশে—

এখন শব্দের জন্য স্থির আকাশ
অস্থির কিশোরীর মতো ধবধপে প্যাডের কাগজ
বাতাসের গতি শান্ত—
হাঁটু গেড়ে বসে আছে সমস্ত মানুষ প্রার্থনায়।

একান্ত শব্দের কাছে যে আকাঙ্ক্ষা
উদ্ধত অমলিন শব্দ তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার
সেই শব্দ চাই আজ নিজস্ব কব্জায়।

তোমাকেই

দৃশ্যপট ভরে থাকছে শুধুই কুশল সমাচারে
অদৃশ্য হাতের পাঞ্জা লড়ে যাচ্ছে অদৃশ্য শত্রুরে
রক্তের ভিতরে রক্ত শোনিতের স্বাদ বুঝি
লবণাক্ত, হয়তো প্রাচীন বট সমূলে উপড়ে যায়
হাহাকার পাখিদের মিশে যায় হাওয়ায় হাওয়ায়।

কাল রাত অন্ধকারে যখন কলকাতার চাঁদ
জব চার্ণকের কীর্তি একা দেখে ইতস্তত ছায়া ফেলে
নষ্ট হয়ে যায় সব ধূসর শ্লেটের লেখা—শিশু মোছে,
খেলাচ্ছলে অভিমান উছলে ওঠে বুকের দু'পাশে

তখনও তোমার কথা আমার একান্তে মনে আসে।

অষ্টাদশী

আমি তো যাবই বলে আছি
সংসার ছিটিয়ে চতুর্দিকে
উদাসীন কলকাতা জুড়ে মেঘের প্রকোপ
ডাক দিচ্ছে দিগন্তরেখায় রুমাল উড়িয়ে অষ্টাদশী।

ব্যক্তিগত কথা

মৃত্যু : প্রেম

বিমল রায়চৌধুরী

[১৯৩০-এর ৬ই ডিসেম্বর ক্যালকাটা নার্সিংহোমে তার জন্ম। জন্মেই মাতৃহীন। তার বাবা ছিলেন রঙ্‌পুরের বামুনডাঙা স্টেটের বড় তরফের জমিদার। তিনি নবজাত শিশুকে এক ইয়োরোপীয়ান গভর্ণেসের তত্ত্বাবধানে শিলং পাঠিয়ে দেন। ৬।৭ বছর পর্যন্ত তার শিলংয়ে কাটে। শিলং থেকে বামুনডাঙায়। বামুনডাঙা থেকে কলকাতায়। ১৩৪।এ ল্যান্সডাউন রোডে তার বাবার শেষতম স্ত্রীর কাছে সে মানুষ হতে থাকে। বর্তমান চিঠিতে কোনো সম্বোধন বা তারিখ ছিল না। কিন্তু এ চিঠি তার আঠারো সাড়ে আঠারো বছর বয়সে সম্ভবতঃ জুন মাসেই লেখা। সে তখন মাছ, মাংসাশিনী, পরশুরামের কুঠার প্রভৃতি কয়েকটি আশ্চর্য গল্প লিখে ফেলেছে। তার গল্প প্রথম ছেপেছিলেন রমাপদ চৌধুরী। এই চিঠির ব্যক্তিগত অংশের উল্লেখ থেকে জানা যায় সে সবে ইন্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষা দিয়েছে। চিঠিতে যে 'শংকর' নামটির উল্লেখ আছে,—সে-ই—প্রয়াত কবি শংকর চট্টোপাধ্যায়। শংকর চট্টোপাধ্যায় চলে গেছেন গতবছর—১৯৭৬-এর ৯ই জুন, বিমল গেলেন ১৯৭৭-এর ৭ই। নিচের চিঠিটি বিমল লিখেছিলেন তাঁর ভাবী স্ত্রী কবিতা সিংহের কাছে। বিমলের আরেক বন্ধু দেবীপ্রসাদ সিংহ সে সময় মৃত্যুবরণ করেন। চিঠিটি তাকে নিয়েই শুরু। বিষয় মৃত্যু এবং প্রেম! এবং এই মৃত্যুর অপ্রতিরোধ্য প্রেমে আক্রান্ত বিমল, এককালের অসামান্য প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন গল্প লেখক বিমল রায়চৌধুরী, অনায়াসে আমাদের ত্যাগ করে গেলেন। এই বিশেষ চিঠিটি মুদ্রণের সুযোগ দেবার জন্য আমরা সাহিত্যিক-জায়া কবিতা সিংহের প্রতি কৃতজ্ঞ।— সম্পাদক]

আমার এক বন্ধু মারা গেল। ওর মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে খবর পেলাম। কিন্তু কেন ও মারা গেল? ওর মৃত্যুতে আমি ভেঙে পড়ছি না কান্নায়, কিংবা দুঃখে।

কিন্তু মনে মনে ক্রমশ দুর্বলতর হয়ে উঠছি। আমাদের বাড়ির সামনে থাকত দেবীপ্রসাদ সিংহ। ওর সংসারের সংসার থেকে আলাদা হয়ে থাকতো। একবার ওর খাবারে বিষ মেশানো হয়েছিল। সেবার বেঁচে উঠেছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ নামক এক ধর্মপরিব্রাজক বলেছিলেন যে একনিষ্ঠভাবে খারাপ বা ভাল যা কিছুই কামনা করা যায় তা মানুষ একসময় না একসময় লাভ করেই। দেবীপ্রসাদের মা চেয়েছিলেন, তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল—"দেবীপ্রসাদ সিংহের মৃত্যু হোক",—দেবীর মৃত্যু হলো। কাজল চিনতো দেবীকে। খবরটা তাকে দেবার পর সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বলল, —ভাবছিস কেন? তুই মরলেও—চ্যুঃ ছেলেটা মরে গেল এর বেশি কেউ কিছু বলবে না। তারপর অবশ্য কাজল অন্যদিকে চলে গেল। কিন্তু কথাটা বিচ্ছিরি লাগলো আমার। কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়। কিন্তু এত ঘটা করে আমাকে শোনানোর দরকার কি? আমার সম্বন্ধে কেউ কোন একনিষ্ঠ কামনা করছে না তো? অবশ্য সেদিন শংকর বলেছিল বটে—তুই মরলে অনেকে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। কথাটা শংকর বোধহয় ঠাট্টা করেই বলেছিল। কিংবা বন্ধুবান্ধবদের ও আণ্ডারএস্টিমেট্ করেছিল। সকলেই যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে তার কি মানে,—দীর্ঘ নিঃশ্বাসও পড়বে অনেক বন্ধুর। যাক্‌গে নিজের মৃত্যুর সম্বন্ধে সেন্টিমেন্টাল্ অবিচুয়ারি লিখছি না, শুধু দেবীর কথা ভেবে দুর্বলতর হচ্ছি। তার কারণও আছে! ছিল।

দেবীর মা দেবীকে বিষ দিয়েছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য, তবু দেবী ভালবাসলো মেয়েকে, একটা মেয়েকে। ভীষণ রোমান্টিক ছেলে ছিল সে। মেয়েটির ছবি অনেকবার দেখিয়েছিল আমায়, মতামত জানতে চেয়েছিল। আমি চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মেয়েটির দেহতত্ত্ব নিয়ে অশ্লীল ইয়ার্কি করে ওর হ্যাংলামোকে ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছিলাম। করেছিও কিছুটা। ও চুপ করে থাকতো আর মাঝে মাঝে করুণার চোখ মেলে দেখত আমাকে। কিন্তু তবু আমার সাহায্য চাইত। চিঠি লিখে দিতাম ওকে, উপহারের দ্রব্যগুলোর গুণাগুণ বর্ণনা করতাম। একা ঘরে থাকতো দেবী, একা রান্না করত। একা বসে থাকতো। কিন্তু দেখে মনে হতো সর্বদাই যেন অন্য এক উপস্থিতি ওকে ঘিরে আছে, ছুঁয়ে আছে। অনেকক্ষণ হেঁটে, অনেক কথা বলে, অনেক তারা দেখে যেন ক্লান্ত, এভাবে চুপচাপ বসে থাকতো দেবী! কাছে গিয়ে বসলে ওর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিটি অলিগলি মেলে ধরত বন্ধু বান্ধবদের সামনে। আমার বাক্যবাণ হার মানত।

মেয়েটির নাম ছিল নদীর নামে। ইরা! ইরাবতী।

—ছাখ্ হাবলু, তোর যা অবস্থা তাতে তুই বরং বিয়েই কর ওকে। নয়তো শেষকালে যৌন বিকারে ভুগবি। একদিন ওর মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম। কিন্তু বিরক্তিটা গায়ে টানল না দেবী। চোখ দুটোকে ছোট থেকে আশ্চর্য বড় করে বলল,

—করবো, চাকরি পেলেই করবো!

অদ্ভুত সিনসিয়ার ছেলে দেবীপ্রসাদ সিংহ। মাস পাঁচেকের মধ্যেই চাকরি যোগাড় করলো কমলালয় স্টোর্সে। ঘর নিল বৌ-বাজারে। ওর বাবার কাছে পরে শুনলাম বিয়ের দিনও ঠিক করেছিল। কিন্তু কি যে হলো! কেন যে হলো! মৃত্যুর ছাঁকনি দিয়ে অকস্মাৎ গলে পড়ল। এশিয়াটিক কলেরা হয়েছিল। শুনলাম এগারোদিন ও বিছানায় ছিল। অবস্থা নাকি ভালোর দিকেই যাচ্ছিল। আর মাত্র দু'দিন পরেই ছাড়া পেতো হাসপাতাল থেকে। কিন্তু কি যে হলো, কেন যে হলো। সকালে নার্স ওষুধ দিতে এসে দেখল দেবীপ্রসাদ সিংহ নামক লোকটার দেহ শিশির গড়ানো পাথরের মতো ঠাণ্ডা! ইরা! ইরাবতী! নামটা প্রথমে ভাল লাগেনি, সেকেলে মনে হয়েছিল।

কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে নদীর নামে মেয়েটির নাম। নদী, যে নদী সমুদ্র পেল না, পাবে না। এরপর হয়তো শুধু আশা আকাঙ্ক্ষার বালিঝরা কূলে কূলে সে নদীর কল্লোল, "কতদূর সমুদ্দুর" ব'লে অনাবশ্যক ছলছলিয়ে যাবে।

দেবীর অসুখ হঠাৎ হয়েছিল, হঠাৎ ওর মৃত্যুও হলো। ওর বালিশের তলায় কোন চিঠি পাওয়া যায়নি, বাকসে কারু ঠিকানা, কাউকে দিয়ে যাইরে সংবাদও পাঠাতে পারেনি।

ইরা! ইরাবতী আজো দিন গুণছে। দেবীর মৃত্যুসংবাদ শোনার রাত্রে ঘুমোতে পারিনি। মনে পড়েছিল, ইরাবতীকে নিয়ে কত ব্যঙ্গ করেছি, কত ইতরতা! পাপ ক্রমশ যেন পাঁক হচ্ছে। দেবীর মৃত্যুশিয়রে উপস্থিত থাকলে ঠিকানা জেনে নিতাম। নার্স ডাক্তারের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে। নাহয়, বানিয়েই বলতাম,

—শেষ সময় পর্যন্ত, আপনার কথা বলতে বলতেই দিদি, মারা গেছে সে। প্রায়শ্চিত্ত হ'ত পাপের। ইরাবতী জীবনের পাথেয় পেত।

কিন্তু কি যে হলো কেন যে হলো! এরপর কিছুদিন ইরা! ইরাবতী অপেক্ষা করবে। তারপর বিয়ে হয়ে যাবে তার; নতুন সংসার-সন্তান-নীড়ের

দিকে চলে যাবে ও। দুপুরের দাওয়ায় বসে হয়তো কোনদিন ভাববে যার আসার কথা ছিল, সে আসে নি। সে আসতে পারেও না।

ইরাবতীর ঠিকানা আমার জানা নেই। জানবার উপায়ও নেই। বিমর্ষ ছিলাম মনে মনে। কিন্তু আজ সকালে কি যেন ভাবতে-ভাবতে মনে হলো ইরাবতীর ঠিকানা আমার অত্যন্ত জানা। ইরাবতীর কাছে কৃত অপরাধের জন্যে ক্ষমা তোমার কাছেই চাইছি '—'। তুমি করো। ইরাবতীও করবে। সব অপরাধের ক্ষমা সকলের কাছে চাওয়া যায় না। '—' কাছে যা চাওয়া যায় দেবীর মার কাছে, এমন কি সেদিনকার বাস স্টপের সামাজিক তোমার কাছেও তা চাওয়া যায় না।

আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত '—' রা তা পারে না। আর পৃথিবী যতদিন ঘুরবে, পারবেও না। কিন্তু তাই বলে ভেব না মানুষ রক্তমাংসের '—' দেহ পেরিয়ে, সামাজিক তোমাকে ভালবেসেছে। জানো, আগ্রার দুর্গে বন্দী হয়ে সাজাহান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ইঁট পাথরের তাজমহলের দিকে তাকিয়ে। তাজমহলই শেষদিন পর্যন্ত তাঁর মন ছেয়েছিল। অথচ তাজমহল মমতাজের কবরখানা মাত্র, আর সম্রাট মমতাজকেই ভালবাসতেন। কিন্তু ঐ হয়, হয়ে আসছে চিরকাল। প্রেম, অনুভূতির তীক্ষ্ণ গঙ্গোত্রী ছাড়িয়ে চিরদিনই ইটকাঠ পাথরের তেল পিচ্ছিল বন্দরে আশ্রয় নেয়। আর মজা কি জানো, গঙ্গোত্রীর টলটলে পরিষ্কার জলের চেয়ে বাবুঘাটের ঘোলাটে কাদামাটি ভাসা জলের দামই বেশি। আসলে '—'ও' —'এর তফাৎই হচ্ছে মমতাজমহল আর তাজমহলের তফাৎ। প্রেম এইভাবে বারবার বস্তু হয়ে আসছে আদিমতম কাল থেকে। প্রেমের এই বস্তু হয়ে যাওয়াকে কেউ কেউ সেকসুয়ালিটি বলেন। কিন্তু, আমি বলি অন্যকথা। ধরো এমন যদি হয় প্রেম বস্তুতে নেমে বস্তুকেই প্রেমময় করে তোলে?

সাজাহানের শেষ চোখে জ্যোৎস্নারাত্রির তাজমহলের চূড়ো যদি মমতাজমহল হয়ে হেসে ওঠে?

.....থাকগে একটা কবিতা শুনবে,

আশ্চর্য মেঘের মত
এসেছিলে তুমি
ফিরে গেছ ফের
নিঃশেষ হলে মৌসুমী।

কি যে হলো? কি করে যে হলো? ইরা! ইরাবতী জানলার শিক ধরে গলিপথে আজো চোখ পেতে বসে আছে। অথচ দেবী নেই। আমি এখনো কালি-কলম-কাগজ দিয়ে তোমায় নির্লজ্জ বিরক্ত করছি ··

···সেদিন শেষ আষাঢ়ের বৃষ্টি দেখেছিলে? একটু বাইরে এসে দাঁড়াবার ইচ্ছে হয়নি? অথচ আমি কি বোকা বোকা রকমের ছেলেমানুষী করেছিলাম! পাঁচটা থেকে নটা পর্যন্ত ভিজেছিলাম! রাস্তার জলে আর বৃষ্টির জলে! বেশিক্ষণ একা একা ভাল লাগেনি। প্রত্যেক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। এমনকি '—'র বাড়িতেও। কিন্তু বেরোবার প্রস্তাবটি করতেই কানে আঙুল দিয়েছিল সকলে। বিমল রায়চৌধুরী পাগল হয়েছে কিনা জানবার জন্যে সাগ্রহে তাকিয়েছিল মুখের দিকে। কিন্তু শংকর ছেলেটা ভাল। এক ডাকে বেরিয়েছিল। তারপর কত দীর্ঘ সেই জলযাত্রা·····

গ্রীষ্ম : উনিশশো সাতাত্তর

উৎপলকুমার বসু

বিদেশী টেলিভিশনে ইন্টারভিউ-এর সময় ইংরেজ অ্যাংরি ইয়াংম্যান সম্প্রদায়ের এক বিখ্যাত ধনী লেখক বলেন যে তিনি সমাজবাদী লেখক নন। তিনি সমাজের শ্রেণীবিভাগ মানেন না। মানুষ হিসেবে তাঁর কাজ অর্থ উপার্জন করা এবং অধিকতর সুখ ও নিরাপত্তাবোধে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া। যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন তিনি অবাক হয়ে বললেন—আপনার আর কী চাই? প্রকাশকরা আপনার দরজায় লেখার জন্য লাইন দিচ্ছেন। অনেকগুলো বাড়িগাড়ি হয়েছে আপনার। আপনার দক্ষিণ ফ্রান্সের ভিলার ছবি মেয়েদের রঙীন কাগজে ছাপা হয়। ছেলেমেয়েরা প্রাইভেট স্কুলে পড়ে। দেশে বিদেশে আপনি লেকচার দিচ্ছেন সাহিত্য বিষয়ে। প্রায় সবই তো আপনি পেয়েছেন—আর কী দরকার?

আমি চাই সিকিউরিটি—লেখক বললেন।

ইন্টারভিউ কর্তা খানিকটা লঘুভাবেই হেসে উত্তর করলেন—আপনি যে সিকিউরিটি খুঁজছেন তা তো 'হাই সিকিউরিটি প্রিজন' ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না। এমন কি হতে পারে যে আপনি আর তেমন ভাল লিখছেন না। যা লিখছেন—তার অধিকাংশই অপাঠ্য। সে জন্যই আপনার মনে ভয় ও নিরাপত্তাবোধের অভাব।

ক্যামেরা লেখকের মুখ থেকে সরে যায়, এবং দু'এক মুহূর্ত অনিশ্চিতভাবে ঘোরাঘুরি করে। তাঁর সময় লাগে আত্মস্থ হতে।

দশক দুয়েক আগে ইংলণ্ডের সাহিত্যে এই লেখকের উদয় হয় এক দূর নক্ষত্রের মতো। উত্তর অঞ্চলের কয়লাখনির প্রদেশ থেকে ইনি প্রথম শোনান বর্তমান কালের বেকার জীবনের কাহিনী ও গোলামীর ইতিহাস। আমলাতন্ত্রের পরিহাস করেন ইনি। এঁর কথাবার্তা ছিল গ্রাম্য, তীব্র এবং লজ্জাহীন। তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনে, আনবিক বোমার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ চলছিল তার মিছিলে এই লেখককে দেখা যায়। ফ্লিট স্ট্রীট এঁকে লুফে নেয় তৎক্ষণাৎ—কেন না এঁর লেখায় ছিল ক্ষতের বিবরণ ও তার জ্বালা। এঁর চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত

হয়। দ্রুত সেরে ওঠেন ইনি যশ ও অর্থের প্রলেপে। এখন আর এঁর কোনো অসুখ নেই।

* * *

ব্যক্তির অসুখ অল্পেই সারে—কিন্তু সমাজের রুগ্নতা কাটে না। এই শহরে—কলকাতায়—তাই দেখি। দেখি পরিচ্ছন্ন বর্তমান ব্রিজ। তার খোপে খোপে ঘর বেঁধেছে ভিখিরীরা। এই তাদের কোঠাবাড়ি, তহশিলদারী দালান ও পুব দক্ষিণ খোলা জীবনধারণ। লক্ষ্মীনারায়ণপুরের সম্ভ্রান্ত চাষী সপরিবারে আস্তাকুঁড় থেকে খুঁটে খাচ্ছেন মাছ ভাত। ওখানে ভোর থেকেই বিয়ের সানাই বাজছে। আধুনিক রেলপথের পাশে পাশে বেড়ে উঠছে নতুন বস্তি—যেখানে একটা ঘরের ভাড়া মাসে ত্রিশ টাকা—কল ও পায়খানা বাইরে। ছাদ দিয়ে জল পড়ে বর্ষায়। মাটির হাঁড়ি বসিয়ে রাখি'—বলে বিধবা রাধা চক্রবর্তী। ঠিকে ঝি—শুধা কাজ করে বাড়িতে বাড়িতে। দুই ছেলে পড়ে অশোকনগর উদ্বাস্তু স্কুলে। খরচ ত্রিশ টাকা। যখন লোডশেডিং শুরু হয়, পাড়ায় জল আসাও বন্ধ হয়, তখন সে, উকিলবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে চিৎকার করে "সোনায় সোহরা"। পায়ে হাজা ও চর্মরোগে সে এনে লাগায় চুরি করে আনা কেমিকেল। কিন্তু হাঁড়িগুলো মাটির তো—টোকা লাগলেই ভেঙে যায়। উকিলবাবুর বাথরুমে দেখেছিলাম লাল নীল প্ল্যাস্টিক। ঐ প্ল্যাস্টিকের হাঁড়ি চাই দু'টো। তারও দাম ত্রিশ টাকা।

উকিলবাবু আমাকে দেখে আপাদমস্তক খুশি হন। 'কবে ফিরলেন? এই দিকেই থাকুন না। বাড়ি খুঁজে দিচ্ছি। পার্ক স্ট্রীট, থিয়েটার রোডে যাবেন না। এসব পাড়ার সুবিধে কি জানেন—পাশেই বস্তি। ঝি-চাকরের অভাব নেই।'

উকিলবাবুর বিষয়বুদ্ধি ও আন্তরিকতা এই বয়সেও আমাকে অভিভূত করে।

* * *

অধ্যাপক অমিতাভ রায় সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করেন—তা'হলে কি আমি ডায়েট করব।

না, না, ড্রাস্টিক কিছু করিস না—আমি সস্নেহে বলি। এক টাকার রসগোল্লাগুলোর বদলে চার আনারটা খা না। এক টাকার দুটো রসগোল্লা সবাই খেতে পারে। কিন্তু চারআনার আটটা—নেহাত নির্লজ্জ না হ'লে তো খাওয়া যায় না।

অঙ্কে তুই এখনো আইনস্টাইন—অমিতাভর অপরিণত মন আকাশ ছোঁয়।

আলাপ ক্রমশ জমে ওঠে গাঙ্গুরামে। অমিতাভর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অরুণ রায়। অরুণ এবং অমিতাভ ভাল রেজাল্ট ক'রে একই বিষয়ে একই কলেজে চাকরি পায়। অমিতাভ গোপনে কলকাঠি নেড়ে দ্রুত হেড অফ দি ডিপার্টমেণ্টের ধাপে ওঠে। অতঃপর তার আত্মতৃপ্তি ও দেহের আয়তন যেন প্রতিযোগিতায় বাড়তে থাকে। নিজেকে নিয়ে চিন্তার আর শেষ নেই। শঙ্খচূড়, বেদেনী ইত্যাদি নিয়ে সে একদা আধুনিক গান লিখত। আজ কোন ধর্মের ষাঁড়ের পিছু নিয়েছে কি না—জানতে ইচ্ছে হয়।

না, না, ধর্মটর্ম নয়—প্রবল হাত ঝাড়ে অমিতাভ। চাই পরিবর্তন—বুঝলি কি না। সমাজের আমূল পরিবর্তন—যার নাম সার্বিক বিপ্লব।

ও—এবার আমি তার চিন্তার খেই পাই। তুই তাহলে জন্তু। আগে তো ছিলি কংগ্রেসে।

তুই তো জানিস না কী দিন গেছে আমাদের জরুরী অবস্থার সময়। পুলিস আমারও পিছু নিয়েছিল।

সে কি—পুলিসের অবিমৃশ্যকারীতায় আমি অবাক হই।

হ্যাঁ, তবে কাজ হয়েছিল কিছু। ট্রেনগুলো আসতো সময়মতো—ভাবতে পারিস—আমাদেরই এই দেশে। এ তো বাবা বিলেত আমেরিকা নয়। দশটার মধ্যে অফিসে না পৌছলে—ব্যস—অমিতাভ গলায় কাল্পনিক ক্ষুর চালায়।

তোকে আরেকটা কথাও ব'লে রাখছি—ভীত বালকের মতো আর সবাইকে ভয় দেখায় অমিতাভ—যে সরকারই আসুক না কেন জরুরী অবস্থার মতো একটা আইন করতেই হবে। না হ'লে এদেশের লোক কাজ করে কখনও। বুঝবি, বুঝবি—থাক কিছুদিন এদেশে।

* * *

জুনমাসের দুপুরে, সাতাত্তরের রৌদ্রময় গ্রীষ্মে, বাস থেকে দেখি জনহীন জগুবাজারের ফুটপাতে হাঁটছেন বিমল রায়চৌধুরী। একা। সাদা ধপধপে ধুতি পাঞ্জাবি পরেছেন। রোদ ঠিকরে পড়ছে গা থেকে। মাথার চুল পাটপাট

আঁচড়ানো। তাঁকে অসম্ভব রূপবান দেখায়। কে মারলো তাঁকে? কে দেখলো তাঁর মৃত্যু?

Who killed Cock Robin ?
"I," said the sparrow.
"With my bow and arrow,
I killed Cock Robin."

Who saw him die ?
"I," said the fly.
"With my little eye,
I saw him die."

Who caught his blood ?
"I" said the fish,
"With my little dish.
I caught his blood."

Who made his shroud ?
"I," said the beetle.
"With my thread and needle,
I made his shroud."

Who'll toll the bell ?
"I," said the bull,
"Because I can pull,
I'll toll the bell."

[বিমল রায়চৌধুরী প্রসঙ্গে ইংরেজী ছড়ার অংশ]

* * *

ইনটেলেকচুয়াল কারা বা ইনটেলেকচুয়ালিজম কি—এ নিয়ে এক বয়েসে আমরা প্রচুর তর্কবিতর্ক করেছি। নানাভাবে এর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলেছিল। অনেকে পরিহাস করতেন এই শব্দ ব্যবহার ক'রে—অনেকে গালাগালিও দিতেন এই সূত্রে। মনে হয় সেই সময় থেকে 'বুদ্ধিজীবী' কথাটার বাংলাভাষায় প্রচলন। কিন্তু রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হ'তে থাকে। ইনটেলেকচুয়ালরা নিজবুদ্ধি খাটিয়ে জীবিকানির্বাহ করেন—এই অর্থ গ্রহণীয় নয় কেননা এর ব্যতিক্রম বহু। আমার

মনে হয় শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ইনটেলেকচুয়ালরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষিত পুরুষ ও নারী যাঁরা ইচ্ছা ও অর্থবলে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় পঠনপাঠন করেছেন এবং নিজ দেশের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বঞ্চিত জনসাধারণের কাছে সেই শিক্ষার বুদ্ধিগ্রাহ্য সারাৎসার, প্রয়োজনীয় তথ্য হিসেবে সমসাময়িক ব্যাখ্যাসহ উপস্থিত করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টার ফল সুদূরপ্রসারী ও বৈপ্লবিক।

বছর দুয়েক আগে আমেরিকান পররাষ্ট্রসচিব হেনরী কিসিনজার চাকরি থেকে ইস্তফা দেন এবং অধ্যপনার কাজ শুরু করেন। কিসিনজারের পাণ্ডিত্য ও কর্মতৎপরতার কাহিনী বহুল প্রচলিত। সেই সময় জনৈক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন—বর্তমান কালের যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশার সুযোগ ঘটেছিল, তাঁদের মধ্যে কাকে তাঁর যথার্থ ও শ্রেষ্ঠ ইনটেলেকচুয়াল ব'লে মনে হয়েছে। এক কথায় এই অধ্যাপক নাম করেন—চৌ এন লাই।

মনে রাখা প্রয়োজন ত্রিশ বছর আগে জেনিভাতে ইন্দোচায়না বিষয়ক আন্তর্জাতিক সভায় তৎকালীন আমেরিকান প্রতিনিধি জন ফস্টার ডালেস চীনা রাষ্ট্রদূত চৌ এন লাই-কে 'কুলি' বলে সম্বোধন করেন এবং তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে বসতে স্বীকৃত হন নি।

* * *

গ্রীষ্ম তা'হলে শেষ হতে চললো—রফি আমেদ কিদোয়াই রোডে দাঁড়িয়ে আমি ভাবি। ঐ তাবিজের দোকান ও ডায়মণ্ড হোটেল। পাশেই মতি তালাও। তার উপর স্বল্প বৃষ্টি হচ্ছে—নাকি জলে ঢেউ উঠেছে ব'লে অমন মনে হয়? এবার শিল নেই, ঝড় নেই, বৈশাখী নেই। গোপনে এল বর্ষাকাল—এমন কি কলকাতা বেতারকেন্দ্র ও তার শৌখিন রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রোতারাও টের পেলেন না—এমনই লঘু বর্ষার চলন। আমি কিনি সবুজ আম—জিভে লাগে তার কাঁচা ও মিঠে আস্বাদ, নুন লাগে—মস্তিষ্ক অব্দি কোলাহল ওঠে। ঝড়ে দোলে ছেলেবেলার অন্ধকার বাগান। 'খোকা, আমগুলো দেখে খাস্।'

তেমন ঝড় আর কখনো দেখি নি। দেখি নি গাছের তলে দাঁড়িয়ে থাকা অমন স্নেহপ্রবণ শান্ত একদল মানুষ ও তাদের অপরিসীম দারিদ্র্য।

বিদেশী সাহিত্য

তাদেউশ রুজেভিচ্-এর কবিতা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১. দ্বিতীয় প্রস্তাব

কবিতাটি
শেষ হ'লো
এবার চাই তার ভাঙচুর
আর যখন আবার সব ভাঙাগুলো জুড়ে যাবে
আরেকবার তাকে ভাঙো সেই জোড়াগুলোয়
যেখানে-যেখানে সে মিলেছে বাস্তবতার সঙ্গে
জোড় খুলে নাও
খুলে নাও এলোপাথাড়ি সব উপাদান
যা আসে কল্পনা থেকে
তারপর যা বাকি থাকে তাকে
বেঁধে ফ্যালো
স্তব্ধতা দিয়ে
অথবা ফেলে রাখো এমনিই না-বেঁধেই
যখন
কবিতাটি শেষ হয়
সরিয়ে নাও তার ভিৎ বুনিয়াদ
যার উপর সে দাঁড়ায়
—কারণ ভিৎ

চলৎশক্তিকে আটকে রাখে—
তার পরেই আস্ত গড়ন
উঠে দাঁড়াবে
আর মুহূর্তের জন্য
উড়াল দেবে
বাস্তবতার উপর
যার সঙ্গে পরিণামে
তার ধাক্কা লাগবে
এই ধাক্কাই
হবে সূচনা
নতুন কবিতার
বাস্তবতার কাছে যে অচেনা
তাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে
তাকে টুকরো ক'রে ফেলে
আর রূপান্তরিত ক'রে

আর নিজের মধ্যেও ঘটিয়ে দিয়ে
রূপান্তর

২. ফিরে-আসা

কিছুতেই মেনে নিতে পারি না
আমার কোনো কোনো কবিতাকে
বৎসর বৎসর কেটে যায়
কিছুতেই তাদের সঙ্গে সন্ধি হয় না আমার
অথচ তাদের অস্বীকার করতে পারি না
তারা ভালো হয়নি কিন্তু তারা আমারই
আমিই তাদের জন্ম দিয়েছিলুম
তারা আমার কাছ থেকে দূরে চ'লে গিয়ে বসবাস করে
উদাসীন আর মৃত

কিন্তু কখনো আসবে সেই মুহূর্ত যখন তারা সবাই
এক ছুটে ফিরে আসবে আমার কাছে
যারা সফল আর যারা ব্যর্থ
যারা স্থূলো ঠুঁটো পঙ্গু আর যারা সুঠাম সুস্থ নিখুঁত
সবাই মিলে-মিশে এক হ'য়ে যাবে
ফিরে আসবে আমার মধ্যে
যাতে আমাকে মরতে না-হয়
শূন্যতায়

৩. এক কবি ও যাত্রীট্রেনের প্রস্থান উপলক্ষে
—ইয়েশি লিসোভস্কির জন্য—

তার শেষ কবিতাটি কেমন হবে
তা সে জানে না
জানে না
কি-রকম হবে প্রথম দিনটি সেই জগতে
যেখানে কবিতা নেই

হয়তো বৃষ্টি পড়বে সেদিন
শেক্সপীয়রের অভিনয় হবে
আর মধ্যাহ্নভোজে থাকবে টোম্যাটোসূপ

কিংবা সেওইওলা মুরগির শুরুয়া
শেক্সপীয়রের অভিনয়
আর বৃষ্টি

কলালক্ষ্মীরা তাকে এমন-কোনো ভরসাই দেননি
যে তার শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে
সে উচ্চারণ করবে কোনো মহান আধ্যাত্মিক ভাবনা
স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন
আরো আলো বা ঐ জাতীয় কিছু

মনে হয়
সে যাবে
ঠিক যেমন যায়
অনেক-আগেই-যার-যাবার-কথা
এমন-কোনো যাত্রীবাহী ট্রেন
জেব্‌শিদোভিৎসে হ'য়ে
রাদোম্‌স্ক্‌ থেকে পারী

৪. বালনিধন

'মা!' ছোটোরা চেঁচিয়ে উঠেছিলো,
কিন্তু আমি তো ভালো হ'য়েছিলুম—
কোনো দুষ্টুমি করিনি!
এখানটায় অন্ধকার! অন্ধকার!'

তাকিয়ে ছাখো ওদের ওরা চ'লে যাচ্ছে পাতালে
ছাখো ছোটো-ছোটো পা
ওরা পাতালে চ'লে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছো
এখানে-ওখানে
এক-একটা ছোটো পায়ের ছাপ

পকেট ফুলে আছে
সুতোয় গুলিতে মারবেলে আর নুড়িতে
তার দিয়ে বানানো ছোটো ছোটো ঘোড়ায়

সব আটকে দিয়ে এগোয় এক বিশাল সমভূমি
জ্যামিতির কোনো উপপাদ্যর মতো

আর কালো ধোঁয়ার এক গাছ
সটান এক উল্লম্ব
মরা গাছ
তার চুড়োয় কোনো তারা নেই

—অশ্‌ভিয়েঞ্চিম শহিদ সংগ্রহশালা, ১৯৪৮

৫. বিনুনি

যখন সব মেয়েদেরই—যাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো—
মাথা মুড়িয়ে দেয়া হ'লো
চার-চারজন মজুর বার্চের ডালপালার ঝাড়ু হাতে
ঝেঁটিয়ে সব
চুল এক জায়গায় জড়ো ক'রে রাখলো

স্বচ্ছ কাচের আড়ালে
প'ড়ে আছে আড়-ধরা রুখু চুলের স্তূপ
সেই তাদের চুল যাদের দম আটকে গেছে বিষবাষ্পের কুঠুরিতে
কাঁকই, ক্লিপ, পিন
সব আছে এই চুলে
আলো প'ড়ে এই চুল ঝিলিক দিয়ে ওঠে না
হাওয়ায় ওড়ে না এলোমেলো
ছোঁয়া পড়ে না কোনো হাতের
বা বৃষ্টির বা ঠোঁটের

মস্ত সিন্দুকের মধ্যে
শুকনো চুলের রাশি-রাশি মেঘ
যাদের দম আটকে গেছে
আর ফিকে বিবর্ণ ফিতে-বাঁধা
এক বিনুনি

দুষ্টু ছেলেরা
স্কুলে যা ধ'রে টানতো

—অশ্‌ভিয়েঙ্কিম, শহিদ সংগ্রহশালা, ১৯৪৮

৬. প্রেম ১৯৪৪

নগ্ন সহায়হীন
ঠোঁটের উপর ঠোঁট
চোখ
বিস্ফারিত

উৎকর্ণ

ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে যাচ্ছিলুম আমরা
সমুদ্রে
অশ্রুর রক্তের

৭. আঙ্গিকগুলো

এককালে এই আঙ্গিকগুলো ছিলো সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত
বাধ্য অনুগত বশম্বদ সর্বদাই গ্রহণ করার জন্য উৎসুক
কবিতার মৃত পদার্থ
আগুনে রক্তের গন্ধে যারা ভয়ে গুটিয়েছিলো
তারা গরাদ ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে ছড়িয়ে গিয়েছে

তারা আক্রমণ করে তাদের স্রষ্টাকে
তাকে ছিঁড়ে ফেঁড়ে হিঁচড়ে টেনে নেয়
অন্তহীন রাস্তায়
যে রাস্তায় অনেক আগেই গেছে
সব বাজনদার সব স্তূপ গির্জে শোভাযাত্রা

খাসালো মাংস
রক্তেভরা
এখনো ঐ নিখুঁত আঙ্গিকগুলোর
খাদ্য

তারা তাদের লুঠের মালের গায়ে এসে পড়ে এত কাছে
যে এমনকি স্তব্ধতাও ভেদ করতে পারে না
বাইরেটা

৮. এক সভা

ক্রমেই ঘন-ঘন আমার দেখা হচ্ছে মৃতদের সঙ্গে
অদ্ভুত জ্যান্ত তারা
তাদের মুখ হা-করা তারা কথা বলে বিস্তর
কারু-কারু মুখে ফেনা উঠে যায়
সাবানের মতো

সম্প্রতি দেখা হ'য়ে গিয়েছিলো এক বড়োগোছের মৃতগোষ্ঠীর সঙ্গে
সার বেঁধে ব'সে ছিলো চেয়ারে
তাদের গাল গোলাপি
তারা হাসছিলো হাততালি দিচ্ছিলো ব'সে পড়ছিলো
ঘৃণায় ধিক্কার দিচ্ছিলো উঠে দাঁড়াচ্ছিলো
ব্যক্তিগত আক্রমণ করছিলো

বুড়োহাবড়া মড়াগুলোর মধ্যে
ব্যস্তভাবে ঘুরঘুর করছিলো ছেলেছোকরারা
তারা জানে না কিছুই
মগজ ফোঁপরা
হাত নাড়ছিলো পা নাড়ছিলো
গাড়ি চালাচ্ছিলো আলিঙ্গন করছিলো নতুন
মত দৃষ্টিভঙ্গি স্ত্রী যারা এখনও উষ্ণ

সেখানে ছিলেন এক অতিঅভিজ্ঞ মৃতদেহ
আমার দিকে তাকিয়ে কেবল চোখ মটকাচ্ছিলেন
লটকমাফিক
আর এমনকি চাচ্ছিলেন চেষ্টা করছিলেন
পুনর্জাত হ'তে
সমবেত মৃতদের চোখের সামনে

—ভার্শাভার লেখক পরিষদে। নভেম্বর ১৯৫৬

৯. ওপর-ওপর তাড়াহুড়োয়

কামের তাড়া টের পাচ্ছি
লোকটা বললো
দুর্ভাগ্য এই যে তার কোনো আত্মা নেই
আত্মা হাপিশ
হেসে কুটিপাটি
রেস্তোরাঁর সেই যুবতী পরিচারিকা
তার চেহারা এমনি থাপসুরৎ
যে একজন আত্মাহীন
তার সঙ্গে মিলে
বানিয়ে দিতে পারে এক নতুন মানুষ
সত্যি তার পাছা
কী চমৎকার নধর কী জমকালো মজাদার
সেই অতিবিখ্যাত
ক্যাথিড্রালের গম্বুজের
চেয়েও—লোকটা ভাবলো—
এক চমৎকার পাত্র
সাময়িকভাবে বন্ধ
আত্মাটাত্মা নিশ্চয়ই ছিনিয়ে নিয়ে গেছে

আগের প্রজাতিরা
আর এখন তাই কাউকে বাঁচতে হয়
যথাসম্ভব যথাসাধ্য
ওপর-ওপর
তাড়াহুড়োয়

১০. আমি গ'ড়ে তুলি

শার্শির উপর দিয়ে হাঁটি
কাচের উপর দিয়ে
যে-কাচে চিড় ধরে
আমি হাঁটি ইয়োরিকের
করোটির উপর
হাঁটি এই পলকা ভঙ্গুর
জগতের উপর

আর গ'ড়ে তুলি এক বাড়ি
আকাশে প্রাসাদ দুর্গ
যার ভিতর সব প্রস্তুত
কোনো অবরোধের জন্য

কেবল আমি
থাকি বিস্মিত
দেয়ালের
বাইরে

১১. আমি দেখি পাগলদের

আমি দেখি পাগলদের যারা
সমুদ্রে হেঁটেছিলো
শেষতক আস্থা রেখে
আর ডুবে গিয়েছিলো

তারা এখনো দোলাচ্ছে
আমার টালমাটাল নৌকো

নিষ্ঠুরভাবে জ্যান্ত আমি ঠেলে সরাই
ঐ আড়ধরা হাতগুলো

বছরের পর বছর তাদের আমি ঠেলে সরাই

১২. আমি লিখছিলুম

আমি লিখছিলুম
মুহূর্তখানেক কিংবা হয়তো এক ঘণ্টাই
সন্ধ্যা রাত্রি
রেগে উঠছিলুম
কাঁপছিলুম কিংবা ব'সেই ছিলুম
চুপচাপ আমার নিজেরই পাশে আমি
চোখ জলেভরা
আমি লিখেছিলুম বেশ কতক্ষণ ধ'রেই
হঠাৎ খেয়াল ক'রে দেখি
আমার হাতে কোনো কলম নেই

১৩. প্রুফ

মৃত্যু শুধরে দেবে না
কবিতার একটা পঙ্‌ক্তিও
মৃত্যু তো কোনো প্রুফপাঠিকা নয়
সে তো নয় কোনো সহানুভূতিশীলা
সম্পাদিকা

যে-কোনো নষ্ট উপমাই অমর

কোনো উচ্ছৃঙ্খল বস্তাপচা কবি যে মারা গেছে
হ'লো এক বস্তাপচা মৃত কবি

চড়ুইদের মধ্যে লেলিয়ে দাও এক হুলোবেরাল

যে একঘেয়ে সে মরার পরেও একঘেয়েমিতে বিরক্ত করে
উজবুক তো তার উজবুকমুখো কিচিরমিচির
বজায় রাখে কবরের ওপাশ থেকেও

রুজেভিচ সম্বন্ধে অনুবাদকের টীকা :

ধর্মের মতো কবিতাও এক বিপুল ধাপ্পা, তাদেউশ রুজেভিচ বলেন। না-হ'লে কেন হ'লো উপনিবেশগুলো, কেন পুঁজিবাদ ও শোষণ, কেন যুদ্ধ আর কনসেন-ট্রেশন ক্যাম্প? টোমাস মান স্তম্ভিতভাবে একবার বলেছিলেন কী ক'রে হিটলারের জার্মানিতে মস্ত প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি লোকের সামনে চমৎকারভাবে বাজানো যাচ্ছিলো বেটোফেনের 'এরোইকা', যার বিষয়বস্তু নির্মম শ্লেষের মতো ছিলো স্বাধীনতা। কিন্তু মান তখন ছিলেন মার্কিন মুলুকে, নিরাপদে। আর রুজেভিচ? যুদ্ধ যখন বাঁধলো তাঁর বয়েস মাত্র আঠারো (তাদেউশ রুজেভিচ-এর জন্ম পোলাণ্ডের রাদোমস্‌কতে ১৯২১ সালে), লেখাপড়ায় এক হ্যাঁচকা টানে ইতি পড়েছিলো তাঁর অনেক সহযোগী লেখকদের মতোই, আর যুদ্ধের ঠিক এক বছর আগেই কিনা রুজেভিচের প্রথম কবিতাগুলো বেরুতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো। তাঁর সমবয়েসী কবিদের মধ্যে বাচিন্‌স্কি আর গাইৎসি মারা গিয়েছিলেন ভার্শাভা

অভ্যুত্থানের সময়, স্ত্রোইনস্কি আর বোরোডস্কি ছিলেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, আর জ্‌বিগনিয়েভ হেরবের্ট প্রতিরোধ বাহিনীর জন্য কাজ করা ছাড়া কিছুই আর করেননি।

যুদ্ধের সময় যা-যা হয়, সব ঘটেছিলো রুজেভিচের সেই সদ্য যৌবনে। নিছক বেঁচে থাকবার জন্য কুলির কাজ করেছেন, গুপ্ত সামরিক স্কুল থেকে পাশ করেছেন পরীক্ষায়, প্রতিরোধে অংশ নিয়েছেন। চোরাগোপ্তা ভাঙাচোরা হাতে-বিন্যাস-করা প্রতিরোধ মুদ্রণালয় থেকে ছাপিয়েছেন তাঁর কবিতা। অবশেষে ১৯৪৫এ ভর্তি হয়েছেন ক্রাকুভ বিশ্ববিদ্যালয়ে, পাঠ্যবিষয় আর্ট হিস্ট্রি। আর শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস পড়বার পর তাঁর বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হয়েছে যে 'শিল্প' চূড়ান্তভাবে মানুষের দুঃখবেদনাকে টিটকিরি দেয়, অপমান করে, অসম্মান করে।

আর এই জন্যেই তিনি তৈরি ক'রে নিয়েছেন তাঁর নিজস্ব এক 'প্রতি-কবিতা,' 'অ্যান্টিপোয়েম'—কাব্যিকতার সব কৌশলকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যা একান্তভাবেই নগ্ন, কৃশকায় ও অসহায় আর নির্মমভাবে সৎ; এই প্রতি-কবিতার অব্যবহিত দাবি ও আঘাত আর আভ্যন্তরীণ হিংস্রতা কেবল এক অসংবরণীয় দয়া ও মায়া দিয়েই শামাল দেয়া। এই বিশৃঙ্খলা ও দুর্বিপাকের মধ্যেও কী ক'রে লোকে তথাকথিত সহজ স্বাভাবিক জীবনযাপন করে—এটাই তাঁর আঘাতের লক্ষ্য—অর্থাৎ তথাকথিত সভ্যতাই তাঁর দ্বারা অভিযুক্ত, দায়রায় সোপর্দ। আর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি এই পশ্চিমী সভ্যতাকে কোনো ছলচাতুরীরই সুযোগ নিতে দেননি। আপোষ তাঁর ধাতে নেই। এদিক দিয়ে অন্য যাঁরা নানা দেশে প্রতি-কবিতার প্রতি উন্মুখ, তাদের সঙ্গেই তাঁর মিল। যেমন চিলির নিকানোর পার্‌রা, জার্মানির হান্‌স মাগনুস এনৎসেন্সবেরগের, চেকোশ্লোভাকিয়ার মিরোস্লাভ হোলুব, ইউগোস্লাভিয়ার ভাস্‌কো পোপা—আর পোলাণ্ডে তাঁর সহযোগী জ্‌বিগ্‌নিয়েভ হেরবের্ট ও আরো তরুণ ইয়েশি হারাসিমোভিচ। নিকানোর পার্‌রা তরুণ কবিদের উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন :

যা খুশি তোমার, লেখো
যে-শৈলীতে তোমার রুচি তাতেই
সেতুর তলা দিয়ে বড়ো বেশি পরিমাণ রক্ত ব'য়ে গেছে
এই বিশ্বাস নিয়েই
যে কেবল একটা পথই নির্ভুল।

কবিতায় সবকিছু চলে।

কেবল এই শর্তটা আছে, বলাই বাহুল্য :
শাদা পাতাকে উন্নত করতে হবে তোমায়।

রুজোভিচ বলেছেন : 'মিল দিতে পারো কিংবা মিল এড়িয়ে যেতে পারো; ব্যবহার করতে পারো উপমা বা উৎপ্রেক্ষা, আবার বর্জন করতে পারো তাকে, ব্যবহার করতে পারো চিত্রকল্প, কিংবা ইচ্ছে হ'লে বাদও দিতে পারো তাকে, হ'তে পারো কৌশলী উদ্ভাবক, কিংবা ইচ্ছে না-হ'লে, নয়···কিন্তু আমার কাছে একটা জিনিশই শুধু মূল্যবান : কথা।' কাজেই রুজেভিচের জন্য পড়েছিলো কেবল দৈনন্দিন কথাবার্তা অভিজ্ঞতা, নিরলঙ্কার, সহজ শাদাশিধে—কিন্তু উদ্বেগে ভরা, উৎকণ্ঠায় ভরা, আতঙ্কে ভরা। 'অ্যাদ্দিন ধ'রে কবিতা যে-সব সুযোগ-সুবিধে পেয়েছে আমি সচেতনভাবে তা বর্জন করতে শুরু করেছিলুম।' তার ফলেই তাঁর কবিতা হ'য়ে উঠেছে মৌল অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ—কোনো ঝালর বা ঝিল্লি লাগানো নেই তাতে—তথ্যের মতোই সত্য, 'খবরকাগজের মতোই সুলভ ও সহজগম্য', অর্থাৎ এনৎসেনসবেরগের যেমন বলেছিলেন, 'আর ওড পোড়ো না। তার চেয়ে টাইমটেবিল অনেক সত্যি', রুজেভিচের কবিতা হ'য়ে উঠেছে এই টাইমটেবিলের মতো জরুরি, প্রয়োজনীয় ও সত্যবাদী।

অন্য প্রতি-কবিতার লেখকদের সঙ্গে তাঁর তফাৎও আছে। অন্য অনেকের অবলম্বন ব্যঙ্গ, শ্লেষ, তীক্ষ্ণ তির্যক্ আঘাত; রুজেভিচ এমনকি ব্যঙ্গও বাদ দিয়েছেন, কারণ হয়তো ব্যঙ্গ আর শ্লেষ খানিকটা ক্ষমা ক'রে দেয় ব্যঙ্গের বস্তুকে। রুজেভিচ ক্ষমা করতে চান না। সভ্যতাকে না, কবিতাকেও না।

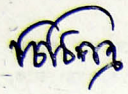

চিঠিপত্র

সবিনয় নিবেদন,

গত সংখ্যায় শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কে "পুরাতনী" বিভাগে প্রকাশিত নিবন্ধটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ইহাতে নতুন তথ্য দিবার এবং নিরপেক্ষ-ভাবে তথ্যগুলি বিচার বিশ্লেষণ করিবার সৎচেষ্টা দেখা গেল। লেখক শ্রীযুক্ত অলোক রায়ের মন্তব্য ও টিকাসমূহও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তবু একাধিক প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। কিন্তু প্রশ্ন করিবো না, কে উত্তর দিবে? শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি তো জীবিত নাই। তাছাড়া পূজা কাহাকে বলে, ধ্যান কি, নির্বিকল্প সমাধিকালে সাধকের দেহলক্ষণ কিরূপ, গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাঁহারা এইসব জানিয়াছেন তাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া সমসাময়িককালে মান্য হইলেও ধর্মমার্গে নিজেরা কখনো বেশীদূর অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই (বারাণসীর গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের কথা শুনিয়াছি, হয়তো তিনি ব্যতিক্রম ছিলেন?)। একশত গ্রন্থ যিনি পাঠ করিয়াছেন, আর একসহস্র গ্রন্থ যিনি পাঠ করিলেন, উভয়ের মধ্যে কে বেশী পণ্ডিত, তাহার উত্তর কি সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া চলে? কেননা কি ধরনের গ্রন্থ পাঠ করা হইয়াছে, কিভাবে পাঠ হইয়াছে তখন তাহাও জানিতে হইবে। অবশ্য জানিয়াও কি তেমন লাভ আছে? পুস্তক পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জন করা তেমন কিছু কঠিন কর্ম নহে, প্রকৃত অর্জন হইল বোধি বা আত্মোপলব্ধি কোন গ্রন্থ যাহা দিতে পারে না। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবধূত বলিব, বা তাঁহাকে পরমহংস বলিব না, তাহা লইয়া বাদানুবাদ নিষ্ফল।

ইহাতো বুঝিতে কাহারো অসুবিধা হইবার কথা নয় যে বেদ, গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি মহান গ্রন্থসমূহ প্রথম লিখিত হইয়া পরে কালক্রমে তাহা হইতে ধর্মের উদ্ভব হয় নাই। বরং বিপরীতটাই সত্য। যাঁহারা যুগে যুগে

মানুষকে আত্ম-উন্নতি ও কর্মসাধনার পথে লইয়া গিয়াছেন তাঁহারা কোন গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া তাহা করেন নাই। বরঞ্চ কালক্রমে তাঁহারাই ঐ সকল ধর্মগ্রন্থের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছেন।

যত মত তত পথ। বোধ হয় রামকৃষ্ণের কাছেই আমরা প্রথম শুনিলাম। সকল ধর্মই মহান, এবং সমভাবে মহান—পরমহংসদেবের এই 'সমভাবে মহান' কথাটির উপরই আমি জোর দিতে চাহিতেছি। বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে নিজ নিজ প্রচারিত ধর্মই শ্রেষ্ঠ এইরূপ প্রচ্ছন্ন একটি অহংবোধ থাকে। থাকিবেই, না হইলে বিভিন্ন কালে নব নব ধর্ম প্রচারের সার্থকতা বা প্রয়োজন থাকিত না। যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তিত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মগুরুদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। না হইলে সর্বধর্মের মূল কথা তো একই!

অবশ্য চূড়ামণি মহাশয় বারংবার বলিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত সৎ ও সরল সদাশয় মানুষ ছিলেন। শুধু সিদ্ধিলাভ তাঁহার ঘটে নাই, কিংবা নির্বিকল্প সমাধিলাভ প্রণালী (শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে তাহা নাকি হইবার নয়!) কোনকালে তিনি অর্জন করেন নাই। করিলে, পরমহংসদেবের নিজের কি উপকার হইতো জানি না, তাঁহার শিষ্যকুলের তেমন উপকার হইতো বলিয়া মনে হয় না। তর্কশাস্ত্রের চূড়ায় পৌঁছিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় শশধর "তর্কচূড়ামণি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শশধর যেমন রামকৃষ্ণের "পরমহংস" উপাধির উৎস সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন আমরা কিন্তু "তর্কচূড়ামণি" সম্পর্কে কোন সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া বলিব "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর…"।

দেবতাদের দেখি নাই। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিয়াছি দেবতাদের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, অমূলক অসূয়ার কোন অভাব ছিল না। সুতরাং একজন দ্বিতীয়শ্রেণীর দেবতা না হইয়া রামকৃষ্ণ যদি একজন প্রথম শ্রেণীর মানুষ হইয়া থাকেন তাহা হইলে তো আরো গৌরবের কথা।

বিনীত

স্বরূপানন্দ সরস্বতী

আনন্দ আশ্রম। বাঙ্গালীটোলা, বারাণসীধাম।

BIVAV

Price Rs. 2.00
Vol. I. Number 4

April—June 1977
RN. 30017/76

কলকাতা পুরসভার মনীষী-বন্দনা

তত্ত্ব ও তথ্য, ভাব ও ভাবনা সমৃদ্ধ অন্যান্য ক'টি প্রকাশন

□ শরৎচন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা : এতে আছে শরৎচন্দ্রের পাণ্ডুলিপি ও হাতে আঁকা ছবির প্রতিলিপি, দুষ্প্রাপ্য ছবি, চিঠিপত্র ও প্রথম সারির সাহিত্যিকদের লেখা বহু সরস ও মনোজ্ঞ রচনা। দাম—৭·৫০

□ অমল হোম বিশেষ সংখ্যা : লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের ইংরেজী ও বাংলা রচনায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটিতে আছে অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত অমল হোমের একটি বহুবর্ণ ছবি। দাম—২·৫০

□ নেতাজী জন্মোৎসব সংখ্যা : এতে ইংরেজীতে ও বাংলায় লিখেছেন সুখ্যাত সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কবৃন্দ। এ'ছাড়া আছে নেতাজীর ১৯টি ঐতিহাসিক ছবি। দাম—২·০০

□ লেনিন জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা : লেনিনের ২১টি ছবি ও তাঁর হাতের লেখার প্রতিলিপিসহ ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরেজী ও বাংলা রচনায় সমৃদ্ধ। দাম—২·০০

□ দেশবন্ধু জন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যা : এই স্মারক সংখ্যাটিতে আছে দেশবন্ধুর ৪৮টি ছবি ও পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি। এ'ছাড়া আছে স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের ইংরেজী ও বাংলায় লেখা সাড়া-জাগানো রচনা সম্ভার। দাম—৫·০০

কিপার অফ রেকর্ডস, কলকাতা পুরসভা, ৫, এস, এন, ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৩ এই ঠিকানায় প্যাকিং ও পোস্টেজ বাবদ বাড়তি ৩ টাকাসহ মানিঅর্ডার পাঠালে রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে আমাদের বই/পত্রপত্রিকা পাঠানো হয়। ভি, পি,-র জন্য অতিরিক্ত ১ টাকা পাঠালে ভি, পি,-তেও বইপত্র পাবেন।

বিশেষ উপহার

পুরসভার পত্র পত্রিকা/বই কমপক্ষে ৫ টাকার কিনলে পুরসভা প্রকাশিত 'কলকাতা শহরটা কার' পুস্তিকা ও কমপক্ষে ১০· টাকার কিনলে 'Corporation and the Twenty Points' পুস্তিকা বিনামূল্যে উপহার পাবেন।

পুস্তকবিক্রেতাদের জন্য সুখবর

আকর্ষণীয় কমিশনে পুরসভা প্রকাশিত পত্র পত্রিকা/বই ইত্যাদির জন্য ইচ্ছুক ডিস্ট্রিবিউটর্স/এজেন্টস্/বিক্রেতাদের পুরসচিবের সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কলকাতার জীবনে কলকাতা পুরসভা